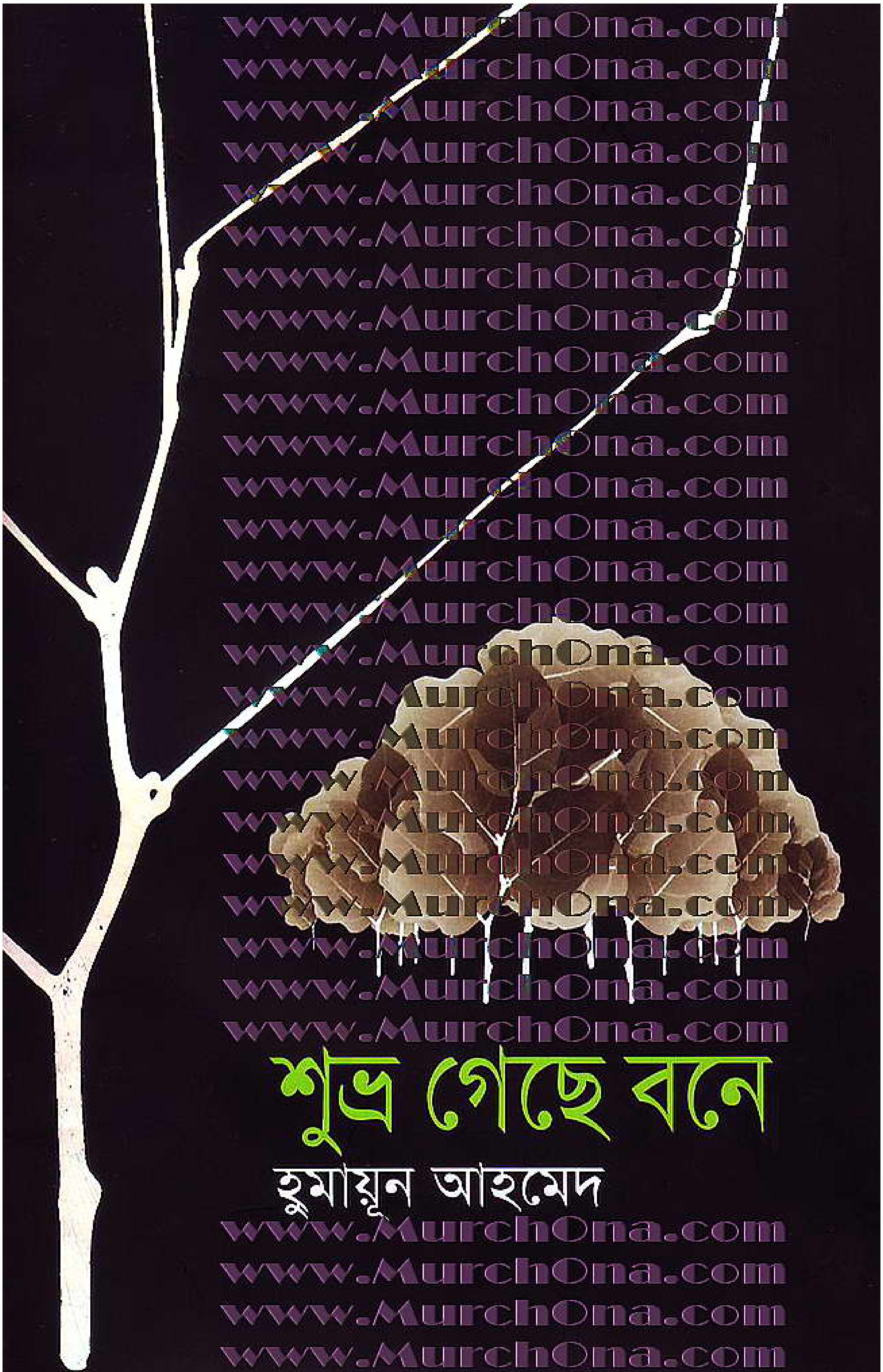
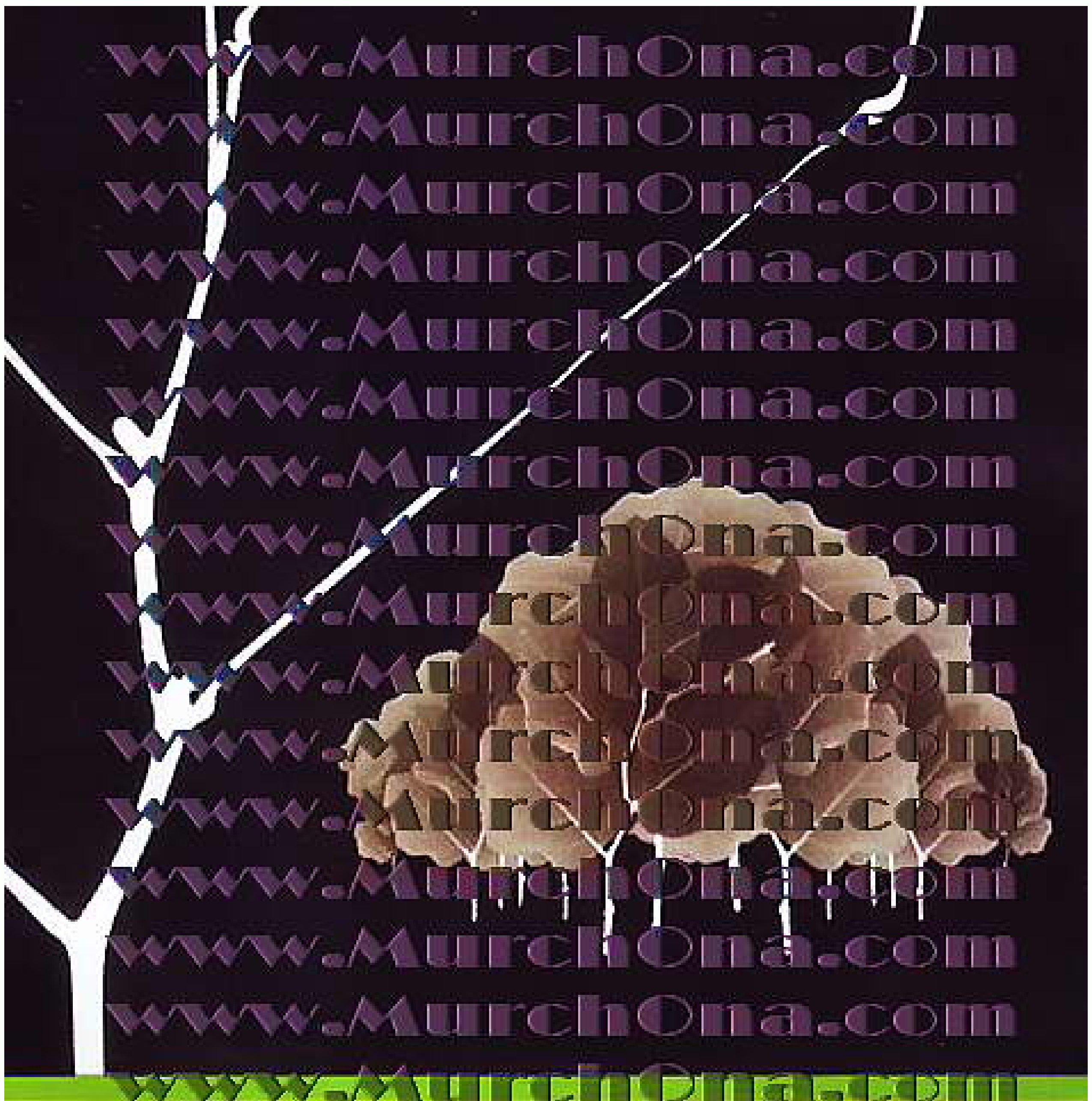
Shuvro Geche Bone by Humayun Ahmed


শুভ্র গেছে বনে
হুমায়ূন আহমেদ



শুভ্র হঠাৎ একটু নড়েচড়ে বসল। তার বেঞ্চের এক কোনায় অল্পবয়েসী একটা মেয়ে এসে বসেছে। বাচ্চা মেয়ে। পনেরো-ষোল বছরের বেশি বয়স হবে না। মেয়েটা এত রাতে পার্কে কী করছে কে জানে! তবে মেয়েটা বেশ সহজ-স্বাভাবিক। তার সঙ্গে লাল রঙের ভ্যানিটিব্যাগ। সে ব্যাগ খুলে একটা লিপস্টিক বের করল। আয়না বের করল। এখন সে আয়োজন করে ঠোঁটে লিপস্টিক দিচ্ছে। এত রাতে মেয়েটা সাজগোজ শুরু করেছে কেন কে জানে! শুভ্র আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। এখন সে কপালে একটা লাল রঙের টিপ দিয়ে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইজান দেখেন তো টিপটা মাঝখানে পড়ছে ? ...

শুভ্রর মতো কাউকে কি আমি চিনি, যাকে এই বই উৎসর্গ করা যায়? না, চিনি না। প্রকৃতি শুদ্ধতম মানুষ তৈরি করে না। কিছু-না-কিছু খাদ ঢুকিয়ে দেয়।

এই বই আমার অচেনা সেইসব মানুষের জন্যে, যারা জানেন তাদের হৃদয় শুভ্রর মতোই শুভ্র।

ভূমিকা

বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটনকে পার্লামেন্ট সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল। তিনি এই দায়িত্ব পালনকালে একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন—'জানালাটা খুলে দিন।' তিনি দ্বিতীয় কোনো বাক্য উচ্চারণ করেন নি।

শুভ্র সারা জীবন বন্ধ জানালা খুলতে চেয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী

সুন্দর একটা দিন। চৈত্র মাসের ঝকঝকে নীল আকাশ। গতকাল বৃষ্টি হয়েছে, আবহাওয়া শীতল। হাওয়া দিচ্ছে।

হঠাৎ সব এলোমেলো হয়ে গেল। একটা প্রাইভেট কারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। ছোটাছুটি, চিৎকার, হৈচৈ। টোকাই ছেলেগুলি আনন্দিত। তারা কোত্থেকে যেন পুরনো টায়ার জোগাড় করেছে। টায়ারে আগুন দিতে চেষ্টা করছে। আগুন ধরছে না। একদল লাঠি হাতে নেমে এসেছে রাস্তায়। তাদের আক্রোশ রিকশার দিকে।

যুথী গিয়েছে ফুল কিনতে। তখন এই কাণ্ড। আজ তার বান্ধবী নীপার জন্মদিনে সে এক প্যাকেট চকলেট এবং ফুল দেবে। আজ সন্ধ্যায় জন্মদিনের উৎসব। ফুল কেনা হয়ে গেছে। নীপা চকলেট খায় না। ফুলে তার এলার্জি। যে-কোনো ফুলের গন্ধে সে হাঁচতে শুরু করে। যুথীর সব বান্ধবী মিলে ঠিক করেছে, সবাই চকলেট এবং ফুল নিয়ে উপস্থিত হবে।

যুথী ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজে, এখনই সন্ধ্যা হবে। যে ঝামেলা শুরু হয়েছে নীপাদের বাসায় মনে হয় যাওয়া হবে না। ফুলের দোকানি হুড নামিয়ে দিচ্ছে। যুথী বলল, ভাই, আমি ফুল কিনব না। টাকা ফেরত দিন। দোকানি বলল, বিক্রি হওয়া জিনিস ফিরত নাই। বদলায়া নিতে পারেন। যুথী অন্য সময় হলে তর্ক করত। এখন তর্কের সময় না। দৌড়ে পালানোর সময়। লোকজন চারদিকেই দৌড়াচ্ছে। কোনদিকটা নিরাপদ সেটা বোঝা যাচ্ছে না। একজন বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা ঝড়ের গতিতে যেতে যেতে চেঁচাচ্ছে, বিডিআর নামছে! বিডিআর! তার গলার স্বরে আনন্দ। যেন বিডিআর নামা উৎসবের মতো। এ দেশের মানুষ বিপর্যয়েও উৎসব খোঁজে।

আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন ?

যুথী চমকে তাকাল। বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরদের মতো চেহারা। বেচারার ফর্সা মুখ আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে। সে ঘনঘন ঢোক গিলছে। যুথী বলল, কী সাহায্য চান ?

চশমা ছাড়া আমি কিছুই দেখি না। আমার চশমা গাড়ির ভেতর। চশমা ছাড়া আমি আপনাকে আবছা আবছা দেখছি। চারদিকে ঝামেলা হচ্ছে তো। খুব ভয় পাচ্ছি।

আপনার গাড়ি কোথায়?

আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছে যে ওইটা আমার গাড়ি। আমার না, আমার বাবার।

দামি গাড়ি না-কি?

জি, বিএমডাবলিউ।

আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছে কেন?

জানি না তো। শুধু যে আমারটা পোড়াচ্ছে তা-না, অনেকেরটাই পোড়াচ্ছে।

যূথী বলল, আপনাকে কী সাহায্য করতে হবে? হাত ধরে আপনার বাসায় পৌঁছে দিতে হবে? এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। খালি রিকশা দেখলে লাফ দিয়ে উঠে পড়বেন। বলবেন যে আপনি পুলিশের আইজির ছেলে।

পুলিশের আইজির ছেলে বলতে হবে কেন?

তা না বললে কোনো রিকশাওয়ালা আপনাকে নেবে না। হাঙ্গামার সময় কোনো রিকশাওয়ালা প্যাসেঞ্জার নেয় না।

আপনার নাম কী?

যূথী বলল, আমার নাম দিয়ে আপনি কী করবেন?

আপনার গলার স্বর খুব সুন্দর তো, এইজন্যে নাম জানতে চাচ্ছি। আমার নাম শুভ্র।

এই সময় বিকট শব্দে কাছেই কোথাও বোমা ফাটল। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না। বোমার শব্দ যেদিক থেকে এসেছে যূথী তার উল্টাদিকে ছুটতে শুরু করল। যূথীর পেছনে পেছনে শুভ্র দৌড়াচ্ছে। যূথী বলল, আপনি আমার পেছনে পেছনে আসছেন কেন?

শুভ্র জবাব দিল না। হাত বাড়িয়ে যূথীকে ধরতে গিয়ে তার শাড়ি ধরে ফেলল। যূথী থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, শাড়ি ধরে টানাটানি করছেন কেন? এটা কী ধরনের অসভ্যতা?

শুভ্র বলল, হাত ধরতে চাচ্ছিলাম। চোখে দেখতে পাচ্ছি না তো, এইজন্যে ভুলে শাড়ি ধরে ফেলেছি। সরি। প্লিজ, আমাকে বকা দেবেন না। আমাকে কেউ বকা দেয় না।

যূথী কঠিন গলায় বলল, আপনাকে থাপ্পড় দেওয়া উচিত। বকা না। এখনো তো আপনি আমার শাড়ি ধরে আছেন। শাড়ি ছাড়ুন।

শুভ্র শাড়ি ছেড়ে দিল।

হঠাৎ শুরু হওয়া ঝামেলা হঠাৎই শেষ হয়। যুথী শাহবাগের মোড় পার হয়েই দেখল সব শান্ত। একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট মোটর সাইকেলে বসে গম্ভীর ভঙ্গিতে কলা খাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি উদাস। যুথী তার কাছে এগিয়ে গেল। সহজ ভঙ্গিতে বলল, কলা খাচ্ছেন ?

ট্রাফিক সার্জেন্ট চমকে তাকাল। যুথী বলল, কিসের গণ্ডগোল হচ্ছিল ?

শ্রমিক লীগের ঝামেলা। তারা উজাইছে।

তাদের উজানো কি বন্ধ হয়েছে ?

পুলিশের হেভি পিটুন খাইছে। বন্ধ হওয়ার কথা।

স্যার, আপনি কি একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন ? কোনো ট্যাক্সি যেতে রাজি হচ্ছে না। আমার গুলশানে যাওয়া খুব জরুরি। আমার এক বান্ধবী নীপার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাকে দেখতে যেতে হবে।

সার্জেন্ট বলল, ট্যাক্সি যাবে না মানে ? তার বাপ যাবে, তার শ্বশুর যাবে। দাঁড়িয়ে থাকেন, ট্যাক্সির ব্যবস্থা হচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে ইয়েলো ক্যাবের ব্যবস্থা হয়ে গেল। যুথী শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, উঠুন। শুভ্র বিনা বাক্যে উঠে বসল। যুথী বলল, আমি অনেক ভ্যাবদা পুরুষ দেখেছি, আপনার মতো দেখি নি।

শুভ্র বলল, ভ্যাবদা মানে কী ?

যুথী বলল, ভ্যাবদা মানে হলো ভেজিটেবল। গাড়িতে করে আমার সঙ্গে রওনা হলেন। কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করবেন না ?

কোথায় যাচ্ছেন আমি তো জানি। কেন জিজ্ঞেস করব ? আপনার বান্ধবী নীপার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তাকে দেখতে যাচ্ছেন।

যুথী বলল, আপনি যা শোনেন তা-ই বিশ্বাস করে ফেলেন। আশ্চর্য ভেজিটেবল তো। আজ নীপার জন্মদিন। সেই পার্টিতে যাচ্ছি। আমি নীপাদের বাড়িতে নেমে পড়ব, আপনি ট্যাক্সি নিয়ে আপনার বাসায় চলে যাবেন। ট্যাক্সির ভাড়া যা হয় দিয়ে দেবেন।

শুভ্র বলল, কীভাবে দেব! আমার মানিব্যাগ তো গাড়িতে আগুনে পুড়ে গেছে।

যুথী বলল, আপনি বাসায় যাবেন। আপনার মা'কে কিংবা বাবাকে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে বলবেন। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। পারবেন না ?

পারব।

আপনার কথাবার্তা মানসিক প্রতিবন্ধীর মতো। আপনি কি মানসিক প্রতিবন্ধী ?

না।

আবার আমার শাড়ি ধরেছেন কেন ?

ভুলে ধরেছি। আমার ভয়টা যাচ্ছে না তো, তাই মনে হয় এরকম করছি। ছোটবেলা থেকেই ভয় পেলে মায়ের শাড়ির আঁচল ধরতাম। অভ্যাসটা রয়ে গেছে।

আমি কি আপনার মা ?

জি-না।

সরে বসুন এবং আমার সঙ্গে আর কোনো কথা বলবেন না। তাকিয়ে থাকবেন না।

যুথী নীপাদের বাড়ির গেটে ট্যাক্সি থেকে নেমে হুট করে গেট দিয়ে ঢুকে গেল। শুভ্র নামের মানসিক প্রতিবন্ধী অনেকক্ষণ তাকে ঝামেলা করেছে। আর ঝামেলা করতে দেওয়া হবে না। এই ধরনের ছেলেপুলেই মৃত্যুর পর সিন্দাবাদের ভূত হয়। ঘাড়ে চাপে, আর নামে না।

পার্টি হচ্ছে নীপাদের বাড়ির ছাদে। ছাদে সুইমিংপুল আছে। উঁচু রেলিং দিয়ে ছাদ ঘেরা। নানান ধরনের গাছ দিয়ে ছাদ সাজানো। নকল এক পাহাড়ের মতো করা হয়েছে। পাহাড়ে বোতাম সাইজের নীল ফুলের গাছ। শুধু ছাদের বাগান দেখাশোনার জন্যে দু'জন মালি আছে। আনোয়ার, সানোয়ার। এরা দুই ভাই। এদের সম্পর্ক আদা-কাঁচকলার চেয়েও খারাপ। দুই ভাইয়ের প্রত্যেকের ধারণা, অন্য ভাই মালির কাজ কিছুই জানে না।

পার্টি এখনো জমে নি। বন্ধুবান্ধবরা আসতে শুরু করেছে। এক কোনায় বিশাল ছাদের নিচে বার সাজানো হচ্ছে। ঢাকা ক্লাবের একজন বারটেন্ডার আছে বারের দায়িত্বে। নীপার বাবা আবদুর রহমান সাহেব দু'একজন বন্ধু নিয়ে মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে সবসময় যোগ দেন এবং দরাজ গলায় বলেন, মা-মণিরা, তোমাদের যাদের বয়স আঠারোর ওপরে, তারা ইচ্ছা করলে বার সার্ভিস নিতে পার। এইসব বিষয়ে আমার কোনো প্রিজুডিস নেই। তবে সাবধান, সীমা লংঘন করবে না। You got to know your limit.

আবদুর রহমান কমার্শিয়েল জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। অবসর নেওয়ার পর জাহাজ ব্যবসা শুরু করেন। এই মুহূর্তে দেশে এবং বিদেশে তাঁর কী পরিমাণ টাকা আছে তিনি নিজেও জানেন না।

দুই-তিন পেগ ব্লু লেবেল হুইস্কি খাওয়ার পর আবদুর রহমান দার্শনিকস্তরে পৌঁছে যান। তখন তিনি উচ্চশ্রেণীর বৈরাগ্য-বিষয়ক কথা বলতে পছন্দ করেন। মেয়ে এবং মেয়ের বন্ধুদের ডেকে বলেন, মা-মণিরা, কী বলছি মন দিয়ে শোনো। আমি যখন মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসি, তখন আমার দু'হাতে দু'টা পাঁচশ টাকার বান্ডিল ছিল না। যখন মারা যাব, তোমরা আমাকে কবরে শোয়াবে, তখনো দু'হাতে দু'টা পাঁচশ টাকার বান্ডিল থাকবে না। জগৎ অনিত্য, এটা আমি বুঝেছি। আমি চাই তোমরাও সেটা বোঝার চেষ্টা করো।

পঞ্চম পেগ খাওয়ার পর তিনি তার মৃত স্কুল-টিচার বাবার কথা মনে করে চোখের পানি ফেলতে শুরু করেন। আবেগ জর্জরিত গলায় বলেন, তিনি ছিলেন টুয়েন্টি ওয়ান ক্যারেট ম্যান। তার মধ্যে কোনো খাদ ছিল না। আমার পুরোটাই খাদ।

এই পর্যায়ে ছাদের মালি আনোয়ার-সানোয়ার তাঁকে ধরাধরি করে নিচে নিয়ে যায়।

নীপা তার শোবার ঘরে চুল ঠিক করছিল। যুথী বসেছে তার সামনে। নীপা রূপকথার বইয়ের বন্দিনী রাজকন্যাদের মতো রূপবতী। সে খানিকটা বোকা। তার প্রধান গুণ সে ভালো মেয়ে। তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচের কোনো ব্যাপার নেই। যুথী বলল, তোদের বাড়িতে কেন আসি জানিস?

নীপা বলল, নিমন্ত্রণ করি, সেইজন্যে আসিস।

তা-না। আমাকে অনেকেই নিমন্ত্রণ করে, আমি কোথাও যাই না। তোদের এখানে আসি তুলনা করতে।

কী তুলনা?

অর্থনৈতিক তুলনা। আচ্ছা আজ এই পার্টিতে খাবার আসবে কোত্থেকে?

কিছু আসবে হোটেল রেডিসন থেকে, কিছু আসবে সোনারগাঁ থেকে।

যুথী বলল, আমাদের বাড়িতে আজ দুপুরে কী রান্না হয়েছে শোন। তিতা করলা ভাজি, কচুর লতি দিয়ে চিংড়ি মাছ আর ডাল। রাতে করলা ভাজি বাদ। দুপুরের কচুর লতি ডাল থাকবে। বাড়তি আইটেম—জাম আলুর ভর্তা।

নীপা বলল, জাম আলুর ভর্তা তো খুবই ভালো খাবার।

যুথী বলল, বৎসরে একদিন খেলে খুবই ভালো খাবার। প্রতিদিন খেলে না।

নীপা বলল, তোর তো অনেক বুদ্ধি। আমাকে একটা পরামর্শ দে। সফিক ভাই বিষয়ে পরামর্শ। সফিক ভাই আমাকে মডেল করে ছবি আঁকতে চায়। রাজি হব?

তুই নেংটু হয়ে থাকবি, সফিক ভাই ছবি আঁকবেন—এরকম ?

প্রায় সেরকম।

ভুলেও রাজি হবি না। বিয়ে হোক। বিয়ের পর যত ইচ্ছা ছবি আঁকবে, তার আগে না।

সফিক একজন শখের পেইন্টার। পেইন্টিং-এ ফ্রান্সে তিন মাসের কী একটা কোর্সও করেছে। এমনিতে ব্যবসায়ী। ঢাকায় কয়েকটা গার্মেন্টস কারখানা আছে। খুলনায় চিংড়ির ঘের আছে। সফিক এমবিএ করেছে আমেরিকায়। নীপার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা। সফিকের বোনরা সব দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের সবাইকে একত্র করা যাচ্ছে না বলে বিয়ের তারিখ করা যাচ্ছে না।

যুথী বলল, সফিক ভাই কি চলে এসেছেন ?

হুঁ। ছাদে বসে আছে। আজ ছাদে তার ছবির প্রদর্শনী হবে। পাঁচটা ছবি নিয়ে এসেছে। পর্দা দিয়ে ঢাকা আছে। করিম আঙ্কেল ফিতা কেটে প্রদর্শনী উদ্বোধন করবেন। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। চল ছাদে যাই।

ছাদে উঠে যুথী হতভম্ব। এককোনায় চেয়ারে শুকনা মুখে শুভ্র বসে আছে। যুথী রাগী ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। যুথীর সঙ্গে নীপাও এগোলো।

কী ব্যাপার! আপনি যান নি ?

ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে নেয় নি। নামিয়ে রেখে চলে গেছে।

ভাড়া না নিয়ে চলে গেছে ?

এই বাড়ির একজন কে যেন ভাড়া দিয়েছেন। তিনিই আমাকে বললেন, ছাদে চলে যেতে। কালো একজন মানুষ। রোগা লম্বা। চোখে চশমা।

যুথী বলল, আপনার বাসার টেলিফোন নাম্বার দিন। টেলিফোন করে দিচ্ছি, বাসা থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে।

শুভ্র বলল, বাসার টেলিফোন নাম্বার আমার মনে নেই। আমার টেলিফোন নাম্বার মনে থাকে না।

নীপা বলল, সমস্যাটা কী ?

যুথী বলল, সমস্যা টমস্যা এখন বলতে পারব না। এই লোক চশমা ছাড়া চোখে দেখে না। শাহবাগ থেকে আমি একে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। তুই কি একে তার বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারবি ?

অবশ্যই পারব। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলছি। আপনার নাম কী ?

শুভ্র।

শুভ্র! শুনুন, আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে এখানে পার্টি হচ্ছে। আপনি ইচ্ছা করলে পার্টিতে জয়েন করতে পারেন। তবে গাড়ি রেডি আছে। এখনই যদি যেতে চান যেতে পারেন।

একটু চিন্তা করে তারপর বলি ?

কোনো সমস্যা নেই। চিন্তা করে বলুন।

পার্টির লোকজন আসতে শুরু করেছে। নীপা ছাদের দরজার পাশে দাঁড়াল। যুথী অবাক হয়ে লক্ষ করল, তার বান্ধবীরা কেউ কথা রাখে নি। কারও হাতেই চকলেটের প্যাকেট এবং ফুল নেই। অতিথিরা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। সবাই কথা বলছে। সবার গলার স্বরই স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু। করিম আঙ্কেল চলে এসেছেন। মেয়েরা তাকে ঘিরে ভিড় করেছে। করিম আঙ্কেলের বয়স ষাট। তিনি বিপত্নীক। তিনি তাঁর রূপবতী প্রাইভেট সেক্রেটারি যমুনাকে নিয়ে এসেছেন। যমুনার বয়স ২৩/২৪। সে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ করেছে ইংল্যান্ডের এক ইউনিভার্সিটি থেকে। যমুনার সঙ্গে তিনি এখন লিভ টুগেদার করছেন। করিম আঙ্কেল অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করেন। মেয়েরাও তাঁর সঙ্গ পছন্দ করে।

নীপা ডায়াসে উঠে হাত নেড়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাসিমুখে বলল, সৌভাগ্যক্রমে আজ পূর্ণিমা। যারা চাঁদের আলোয় সুইমিংপুলে নামতে চাও তারা নামতে পার। আমি বেশ কয়েক সেট সুইমিং কস্টিউম আনিয়ে রেখেছি। সুইমিং-এর সময় ছাদের সব বাতি নিভিয়ে দেওয়া হবে। পুরুষরা কেউ সুইমিং করতে পারবে না। আমরা যখন সুইমিং করব, তখন পুরুষদের চলে যেতে হবে ছাদের দক্ষিণ দিকে। খাবার সেখানেই দেওয়া হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হবে।

করিম আঙ্কেল বললেন, নীপা! মা, তুমি তো অত্যন্ত গর্হিত কথা বলছ। তালেবান টাইপ কথা। তোমরা মেয়েরা জলকেলি করবে আর আমরা চোখ বন্ধ করে দক্ষিণের ছাদে বসে থাকব তা তো হবে না। আমরা পুরুষরা সুইমিংপুলের চারপাশে থাকব। তোমাদের উৎসাহ দেব। তোমরা ডুবসাঁতার দিবে, আমি হব তার জাজ। নারীদের দৈহিক সৌন্দর্য স্থলে একরকম, জলে আরেক রকম। আজ শ্রেষ্ঠ জলনারী নির্বাচিত হবে। আমরা প্রত্যেকেই তার গায়ে জল ছিটিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাব।

নীপা বলল, আঙ্কেল চুপ করুন তো। বার ওপেন হয়েছে। আপনি বরং বারে গিয়ে বসুন।

করিম আঙ্কেল বললেন, রাত আটটার আগে আমি মদ্যপান করি না। রাত আটটা থেকে সাড়ে ন'টা হলো আমার Time of intoxication. তবে আজ বিশেষ দিন হিসেবে নিয়মের ব্যতিক্রম করা যেতে পারে।

তিনি যমুনার হাত ধরে বারের দিকে এগুলেন। নিজের জন্যে এক পেগ রয়েল স্যালুট নিলেন। যমুনার জন্যে টাকিলা। সফিক এসে বলল, চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করে তারপর গ্লাস নিয়ে বসুন।

করিম আঙ্কেল বললেন, গ্লাসের সঙ্গে চিত্রকলার কোনো বিরোধ নেই সফিক। চিত্রকলার গ্রান্ডমাস্টাররা সবাই পাড়মাতাল ছিলেন। ভালো কথা, তোমার পেইন্টিং কি বিক্রি হবে?

সফিক বলল, বিক্রির কথা ভাবি নি। কেউ কিনতে চাইলে ভাববো।

তোমার ওখানে কি কোনো Nude ছবি আছে? যদি থাকে আমি কিনব। আছে?

আছে।

ভেরি গুড। পৃথিবীর সৌন্দর্য মাত্র দু'টি জায়গায়। 'আলোছায়ার খেলাতে এবং নারীদেহে।' কার কথা জানো?

মনে হচ্ছে আপনার নিজের কথা।

না। Claude Monet এর কথা। তাঁর আঁকা Nude ছবি 'Olympia' দেখার মতো চিত্রকর্ম। মনেটের ভাবশিষ্য আমেরিকান মহিলা পেইন্টার Mary Cassatt. ইম্প্রেশনিস্ট ধারার শিল্পী। তিনি কিন্তু কোনো Nude ছবি আঁকেন নি। মহিলা শিল্পীরা মনে হয় কোনো বিচিত্র কারণে তাঁদের শরীর নিয়ে বিব্রত থাকেন বলে শরীর আঁকেন না। যাই হোক, চলো চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করা যাক।

করিম আঙ্কেল চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে চিত্রকলার ইতিহাস বিষয়ে ছোট্ট ভাষণ দিলেন, ভাষণ শেষ হলো Cubism-এর ওপর।

'Cubism শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Louis Vauxcellos, যিনি জীবনে কখনো ছবি আঁকেন নি। তিনি একজন আর্ট ক্রিটিক মাত্র।'—এই ছিল করিম আঙ্কেলের শেষ কথা। তিনি প্রদর্শনীর ছবিগুলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বারে ফিরে গেলেন।

বারের পাশেই শুভ্র বসে আছে। তিনি শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যালো ইয়াং ম্যান! সবাই আগ্রহ করে ছবি দেখছে আর তুমি ঝিম ধরে বসে আছ, ব্যাপার কী?

শুভ্র বলল, আমি চশমা ছাড়া দূরের কিছু দেখি না। এইজন্যে বসে আছি। আপনার বক্তৃতা আগ্রহ করে শুনলাম। আপনি অনেক জানেন।

ইয়াং ম্যান! আমি অনেক বিষয় সম্পর্কেই জানি। তাতে কিছু যায় আসে না। মদ্যপানের অভ্যাস আছে ?

জি-না।

বিয়ার খাও। বিয়ার মদের মধ্যে পড়ে না। অনেক দেশেই কুলকুচরি কাজে ব্যবহার করা হয়। দিতে বলব একটা আইসকোল্ড বিয়ার ?

জি-না।

করিম আঙ্কেল নিজের গ্লাসের দিকে মনোযোগ দিলেন। সফিক এসে তার পাশে বসল। করিম আঙ্কেল বললেন, ড্রিংকস নেবে ?

সফিক বলল, এখন না।

এখন না তো কখন ? শিল্পী মানুষ, তোমরা তো এর ওপরই থাকবে।

আমার ছবি কেমন দেখলেন ?

অনেস্ট অপিনিয়ন চাও না-কি ডিসঅনেস্ট অপিনিয়ন ?

অনেস্ট অপিনিয়ন।

ছবি কিছু হয় নি। দামি ক্যানভাস নষ্ট করেছ। রঙ নষ্ট করেছ। সবচেয়ে খারাপ এঁকেছ Nude ছবিটা। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল থেকে এসেছে। তার সারা শরীরে দুর্ভিক্ষের ছাপ। শুধু তার পশ্চাদ্ভাগ দুর্ভিক্ষমুক্ত। প্রোটিনের অভাবে রুগ্ন এক নারী বিশাল পাছা নিয়ে শুয়ে আছে। এইসব ছবি মডেল দেখে আঁকতে হয়।

মডেল পাওয়াই তো সমস্যা।

করিম আঙ্কেল বললেন, আমাকে বললেই আমি মডেল জোগাড় করে দেই। যমুনা মডেল হতে রাজি হবে। তার ফিগার পারফেক্ট না হলেও ভালো। যমুনা, তুমি কি রাজি হবে ? মহান শিল্পের কারণে কিছুক্ষণের জন্যে বস্ত্র বিসর্জন। ঘণ্টা দু'য়েকের জন্যে দ্রৌপদী হবে। ভাববে তোমার বস্ত্র হরণ হয়েছে।

যমুনা কিছু বলল না। টাকিলার গ্লাসে চুমুক দিল।

মেয়েরা কয়েকটা দলে ভাগ হয়েছে। তিনজনের একটা দল ছাদের এক কোনায় বসেছে। এই দলের প্রধানের নাম নামিরা। সে দু'টা ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে এসেছে। ইয়াবা নেশা করার পদ্ধতি শেখাচ্ছে। একজন বলল, আমি তো জানি গিলে খেতে হয়।

নামিরা বলল, গিলে খেতে চাইলে গিলে খা। আমি কী করছি আগে দেখ। এই ফয়েলে ট্যাবলেট রাখলাম। এখন লাইটার দিয়ে ফয়েলের নিচে আগুন দেব। ট্যাবলেট গরমে গলে যাবে। ধোঁয়া বের হবে। সেই ধোঁয়া নাকে টেনে নিতে হবে। ট্যাবলেট সবসময় নড়াচড়া করতে হবে। এক জায়গায় রাখা যাবে না।

ধোঁয়া নাকে নিলে কেমন লাগবে?

নিয়ে দেখ কেমন লাগে।

ভয় লাগছে তো।

নামিরা বলল, ভয় লাগলে নিবি না।

ট্যাবলেটের নিচে লাইটার দিয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। হালকা ধোঁয়া বের হচ্ছে। নামিরা বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে চাপা গলায় বলল, আহ্।

করিম আঙ্কেল গ্লাস হাতে সুইমিংপুলের পাশে এসে বসলেন। যমুনা তাঁর সঙ্গে নেই। নীপা এবং তার বন্ধুরা করিম আঙ্কেলকে ঘিরে বসেছে। তিনি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, মানুষের দশটি প্রধান আনন্দ কী তোমরা জানো?

নীপা বলল, আমরা কিছুই জানি না। আপনি কী জানেন বলুন।

করিম আঙ্কেল বললেন, আনন্দের তালিকায় প্রথমেই আছে Sex। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করার কিছু নেই। যেটা সত্য সেটা বলতেই হবে। এখন তোমরা বলো, দ্বিতীয় প্রধান আনন্দ কী?

নীপা বলল, গান শোনা?

করিম আঙ্কেল বললেন, হয় নি। দ্বিতীয় প্রধান আনন্দও হলো Sex। তৃতীয়ও তাই। চতুর্থ হচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গ। পঞ্চম হলো Food। ষষ্ঠ হলো Music। সপ্তম হলো দৃষ্টিনন্দন বস্তু। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। অষ্টম হলো Books।

নীপার বন্ধু জয়তী বলল, ভালোবাসা কি কোনো আনন্দের ব্যাপার না?

করিম আঙ্কেল জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, My dear child. ভালোবাসা বলে কিছু নেই। ভালোবাসা হচ্ছে এমন একটা শব্দ যা রাজশেখর বসু তাঁর চলন্তিকা ডিকশনারিতে ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ তিনি লিখেছেন— 'প্রীতি করা, কাহারো প্রতি অনুরক্ত হওয়া, পছন্দ হওয়া'। ডিকশনারির বাইরে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। তোমরা চাইলে প্রমাণ করে দিতে পারি।

প্রমাণ করুন।

একটি শর্তে প্রমাণ করব। তোমাদের সঙ্গে আমাকে জলে নামতে দিতে হবে। কি রাজি?

জয়িতা বলল, আমি রাজি। নীপা, তুই কী বলিস ?

নীপা বলল, না।

যুথী শুভ্রর সামনে এসে দাঁড়াল। বিরক্ত গলায় বলল, আপনি এখনো বসে আছেন ?

শুভ্র বলল, বাসায় একা একা থাকি। কোথাও যাই না। আজ চারদিকে হৈচৈ আর আনন্দ দেখে খুব ভালো লাগছে।

যুথী বলল, আমি বাসায় চলে যাচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে। নীপার গাড়ি আমাকে প্রথমে নামাবে, তারপর আপনাকে নামাবে।

আপনি চলে যাচ্ছেন কেন ?

বাসা থেকে টেলিফোন এসেছে, বাবার শরীর হঠাৎ খুব খারাপ করেছে। বুকে ব্যথা। কাজেই চলে যাচ্ছি।

শুভ্র বলল, শ্রেষ্ঠ জলনারী প্রতিযোগিতাটা করবেন না ? আমার দেখার শখ ছিল কে হয় শ্রেষ্ঠ জলনারী। আমার ধারণা আপনি হতেন।

যুথী বলল, আপনাকে খুব কঠিন কিছু কথা বলার ইচ্ছা ছিল। বলছি না, কারণ আপনার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হবে না।

শুভ্র বলল, কিছু কঠিন কথা বলুন তো আমি শুনি। আপনার গলার স্বর খুব মিষ্টি তো। আমার জানার শখ মিষ্টি গলায় কঠিন কথা শুনতে কেমন লাগে।

যুথী বলল, আপনি নির্বোধ মানসিক প্রতিবন্ধী একজন মানুষ। গাধামানব সম্প্রদায়ের একজন। আপনার নিজের গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আপনার তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নাই। আপনি অচেনা এক মেয়ের জন্মদিনের উৎসবে এসে বসে আছেন। শ্রেষ্ঠ জলনারী নির্বাচন দেখবেন। ছিঃ!

যুথীর বাবা আজহার ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে কাজ করেন। ফিল্ড ইন্সপেক্টর। তিনি শোবার ঘরে খাটের ওপর বসা। তাঁর মুখভর্তি পান। হাতে বিড়ি। খরচ কমানোর জন্যে ইদানীং বিড়ি খাওয়া ধরেছেন। তিনি মন দিয়ে টিভিতে একটা নাটক দেখছেন। এক পাগল পুকুরে বাস করে—এই হলো নাটকের কাহিনী। পাগলের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি যথেষ্টই মজা পাচ্ছেন। যুথীকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি টিভি বন্ধ করে দিলেন। বড় মেয়েকে তিনি বেশ ভয় পান।

যুথী বলল, বাবা! তোমার না শরীর খারাপ ?

আজহার বললেন, খারাপ ছিল। এখন ঠিক হয়েছে। হঠাৎ ব্যথা উঠল, ভাবলাম হার্টের কোনো সমস্যা বোধহয়। এখন বুঝছি হার্টের কিছু না। গ্যাস হয়েছিল। গ্যাস বেশি হলে ফুসফুসে চাপ দেয়, তখন ব্যথা হয়।

যুথী বলল, বাবা, তোমার কিছুই হয় নি। আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরানোর জন্যে এই কাজটা করেছ। আমি বারবার বলেছি, রাত এগারোটার মধ্যে ফিরব। নীপা গাড়ি দিয়ে নামিয়ে দিবে।

যুথীর মা সালমা বললেন, তোর বাবার সত্যি ব্যথা উঠেছিল। এমন ভয় লাগল। পাখা দিয়ে বাতাস করলাম অনেকক্ষণ। ইলেকট্রিসিটি ছিল না তো, এইজন্যে পাখা দিয়ে বাতাস।

যুথী বলল, পাখা কোথায় যে পাখা দিয়ে বাতাস ? এই বাড়িতে তো কোনো পাখা নেই। কেন মিথ্যা কথা বলছ মা ?

আজহার কথা ঘুরাবার জন্যে বললেন, মা, খেয়ে এসেছিস ?

যুথী বলল, আটটার সময় কী খেয়ে আসব ? খাবার দিবে রাত দশটায়।

আজহার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েকে একটা ডিম ভেজে ভাত দাও। পটলভাজি আছে না ? পটলভাজি ভালো হয়েছে। মা যুথী, যাও খেয়ে আসো। পিতামাতা যদি ভুলও করে তারপরেও তাদের উপর রাগ করতে নাই। তবে বুকের ব্যথার ব্যাপারটা মিথ্যা না।

যুথী খেতে বসেছে। সালমা বললেন, তুই কি তোর বাবার মানিব্যাগ থেকে কোনো টাকা নিয়েছিস ? পাঁচশ' টাকার হিসাব মিলছে না।

যুথী বলল, মা, আমি আমার নিজের খরচ টিউশনির টাকায় করি। তোমাদের কাছ থেকে একটা পয়সা নেই না।

সালমা বললেন, তোর বাবার তো সব হিসাবের টাকা। হিসাব না করলে সংসারও চালাতে পারত না। একটা মানুষ হিসাব করতে করতে বুড়ো হয়ে গেল। তার কোনো শখ মিটল না, আহ্লাদ মিটল না।

যুথী বলল, পুরনো ঘ্যানঘ্যানানি বন্ধ করো তো মা। বুদ্ধি হবার পর থেকে তোমার এই ঘ্যানঘ্যানানি শুনছি।

সালমা চুপ করে গেলেন।

রাত দশটায় টিফিন কেরিয়ার ভর্তি খাবার পাঠাল নীপা। আজহার দ্বিতীয়বার খেতে বসলেন। আনন্দে তাঁর চোখমুখ ঝলমল করতে লাগল। তিনি কয়েকবার বললেন, টুনু বাড়িতে থাকলে মজা করে খেত। মিস করল। বিরাট মিস।

টুনু আজহারের বড় ছেলে। সে দেশের বাড়িতে গেছে ধান-চালের ভাগ আনতে।

স্বামীর সঙ্গে সালমাও খেতে বসেছেন। একটা খাবার মুখে দিয়ে বললেন, মাছ কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি লাগছে।

আজহার বললেন, কথা না বলে আরাম করে খাও তো। হাই ক্লাস ফুড মিষ্টি মিষ্টি হয়। লোয়ার লেবেল ফুড হয় ঝাল। এমন ঝাল যে মুখে দেওয়া যায় না। যুথী মা! সব কি ঘরের রান্না ?

যুথী বলল, খাবার এসেছে হোটেল সোনারগাঁ আর হোটেল রেডিসন থেকে।

আজহার বললেন, বললাম না হাই ক্লাস ফুড! যুথী মা, তুইও বোস। মাংসের এই আইটেম অসাধারণ হয়েছে।

যুথী বলল, প্রতিটি কথার শুরুতে একবার করে যুথী মা বলবে না। শুধু যুথী ডাকবে।

আজহার বিস্মিত গলায় বললেন, নিজের মেয়েকে মা ডাকতে পারব না!

যুথী বলল, বাবা খাও তো। কথা বন্ধ।

যুথী বাবা-মা'র খাওয়া দেখছে। তাদের এক রাতে দ্বিতীয়বার খেতে বসা এবং আনন্দের সঙ্গে খাওয়ার দৃশ্য দেখে হঠাৎ তার চোখে পানি এসে গেল। চোখের পানি গোপন করার জন্যে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল।

শুভ্র বাথরুমে।

হট শাওয়ার নিচ্ছে। তার মা রেহানা বাথরুমের বাইরে তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। রাগে তাঁর শরীর জ্বলে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে রাগ সামলে রেখেছেন। ছেলে নানান ঝামেলার ভেতর দিয়ে গিয়েছে। এখনো রাতের খাবার খায় নি। খাওয়া শেষ হোক। তাকে কঠিন কিছু কথা আজ রাতে শুনতেই হবে, তবে এখন না।

বাথরুমের দরজা সামান্য খোলা। শুভ্র কখনোই বাথরুমের দরজা বন্ধ করে না। ছোটবেলায় একবার বাথরুমের দরজা বন্ধ করে আর খুলতে পারে নি। দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করা হয়। সেই থেকে তার ভেতর ভয় ঢুকে গেছে।

শুভ্র, মাথায় শ্যাম্পু দিয়েছ ?

হুঁ।

মাথায় গরম পানি দিয়ো না।

আচ্ছা।

যে মেয়েটা তোমাকে উদ্ধার করেছে তার নাম যেন কী ? তুমি একবার বলেছ। আমি ভুলে গেছি।

যুথী।

মিডল ক্লাস ফ্যামিলি নেম।

নাম থেকে ক্লাস বোঝা যায় মা ?

অবশ্যই বোঝা যায়। যুথী, বকুল, পারুল, এইসব ফুলের নামে নাম হয় লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে।

শুভ্র কি খুব হাই ক্লাস নাম মা ?

তোমার গায়ের রঙ দেখে তোমার নাম দিয়েছিলাম শুভ্র।

ওরাও হয়তো তাই করেছে। ফুলের মতো স্বভাব দেখে ফুলের নামে নাম রেখেছে।

যুথী মেয়েটার স্বভাব ফুলের মতো ?

উঁহু। খুব রাগী। আমাকে কঠিন গলায় গালি দিয়েছে। আমাকে বলেছে, মানসিক প্রতিবন্ধী, গাধামানব।

তুমি চুপ করে গালি শুনলে ?

হ্যাঁ। আমি নিশ্চয়ই তাকে গালি দেব না। মা, মেয়েটার গলার স্বর অস্বাভাবিক মিষ্টি।

গলার স্বরের টক মিষ্টি বুঝা শিখলে কবে থেকে ?

তুমি রাগ করছ না-কি মা ?

তোমার খাটের ওপর টাওয়েল রাখলাম। আমি টেবিল সাজাতে বলছি। তুমি খাবার টেবিলে চলে এসো।

আচ্ছা।

শুভ্র'র বাবা মেরাজউদ্দিন সাহেব খাবার টেবিলে ছেলের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর হাতে এই সংখ্যা *National Geographic.* গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ওপর একটা লেখা ছাপা হয়েছে। মন দিয়ে পড়ছেন। শুভ্র ঘরে ঢুকতেই তিনি পত্রিকা বন্ধ করলেন এবং বললেন, সারা দিন তোমার ওপর দিয়ে অনেক ঝামেলা গিয়েছে শুনেছি। কীভাবে উদ্ধার পেয়েছ তাও শুনেছি। তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন, তবে খাবার টেবিল উপদেশ দেওয়ার Forum না।

শুভ্র বলল, কেমন আছ বাবা ?

মেরাজউদ্দিন বললেন, ভালো আছি। বেশির ভাগ সময় আমি ভালো থাকি। তোমার মা বেশির ভাগ সময় তোমার চিন্তায় অস্থির থাকেন। আজ তোমার কোনো খবর না পেয়ে তার প্রেসার নিচেরটা একশ দশে চলে গিয়েছিল।

শুভ্র বলল, বাবা! তোমার গাড়িটা ওরা পুড়িয়ে ফেলেছে। সরি ফর দ্যাট।

মেরাজউদ্দিন বললেন, সরি হবার কিছু নেই। গাড়ির সবরকম ইনস্যুরেন্স করা আছে। গাড়ির প্রসঙ্গ থাকুক। যে মেয়েটির জন্মদিনে অনিমন্ত্রিতভাবে

উপস্থিত হয়েছিলে, তাকে আগামীকাল ভোরবেলা একটি উপহার পাঠাবে। আর যে মেয়েটি তোমাকে সাহায্য করেছে, তাকেও একটা উপহার পাঠাবে।

শুভ্র প্লেটে খাবার নিতে নিতে বলল, এটা তো বাবা সম্ভব হবে না। বাসায় ফেরার সময় গাড়িতে বসে ছিলাম। বড় গাড়ি, যূথীদের বাড়ির গলিতে ঢোকে নি। ওদের বাড়িটা চিনি না।

যে বাড়ি থেকে গাড়িটা এসেছে সে বাড়িটা চিনবে না?

না।

মেরাজউদ্দিন খাবার মুখে দিতে দিতে বললেন, তারপরেও মেয়ে দু'টির ঠিকানা বের করা সম্ভব।

রেহানা বললেন, কীভাবে সম্ভব?

মেরাজউদ্দিন বললেন, মাতা-পুত্র দু'জনে মিলে চিন্তা করো কীভাবে সম্ভব?

রেহানা বললেন, শুভ্র যদি কিছু মনে করতে না পারে এবং মেয়ে দুটির টেলিফোন নাম্বার যদি তার কাছে না থাকে তাহলে কোনোভাবেই সম্ভব না। শুভ্র, তোমার কাছে কি ওদের টেলিফোন নাম্বার আছে?

না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, শুভ্রকে নিয়ে গাড়ি যখন আমার বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকেছে তখনি সিসি টিভিতে ছবি উঠেছে। কাজেই গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আমাদের জানা। এছাড়াও গেটের দারোয়ানদের বলা আছে, যে গাড়িই ঢুকবে তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তারা লিখে রাখবে।

শুভ্র বলল, বাবা, তোমার অনেক বুদ্ধি।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তোমারও অনেক বুদ্ধি। তবে তুমি বুদ্ধি ব্যবহার করো না। ব্যবহার না করলে বুদ্ধি কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। তোমাকে যদি একমাস ঘন অন্ধকার একটা ঘরে আটকে রাখা হয়, একবারও যদি সেই ঘরে আলো জ্বালা না হয়, তাহলে একমাস পর দেখা যাবে তুমি চোখে কিছু দেখছ না। তুমি পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছ। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। গল্পগাথা না। ব্রিটিশ আমলে অনেক রাজবন্দিকে অন্ধকূপে মাসের পর মাস রাখা হয়েছে। তাঁদের বেশির ভাগই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এরকম একজন অন্ধ রাজনীতিবিদের কথা *ভাসানী যখন ইউরোপে* বইটিতে আছে। বইটির লেখকের নাম খোন্দকার ইলিয়াস।

রেহানা বললেন, বক্তৃতা বন্ধ করো। খাওয়ার সময় এত বক্তৃতা ভালো লাগে না। কাঁচা কাঁঠাল দিয়ে গরুর মাংসের এই তরকারিটা কেমন হয়েছে বলো?

ভালো।

নতুন বাবুর্চি রেঁধেছে। তার প্রবেশন পিরিয়ড যাচ্ছে। আগামী একমাস সে যদি ভালো রাঁধতে পারে, তাহলে চাকরি পার্মানেন্ট হবে। কাজেই এখন থেকে আগামী একমাস রাতের খাবারের পর কোন আইটেম কেমন হয়েছে আমাকে বলবে। এক থেকে দশের ভেতর নাম্বার দেবে। কাঁঠাল-গরু মাংস—কত দিচ্ছ ?

ছয়।

শুভ্র, তুমি কত দিবে ?

আমিও ছয়। বাবা যা নাম্বার দিবে আমিও তাই দিব। কারণ বাবা হচ্ছে আমার Idol.

মেরাজউদ্দিন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কাজের বুয়া রহিমা হাসিমুখে খাবার ঘরে ঢুকে বলল, আম্মা, ভাইজানরে টিভিতে দেখাইতেছে।

মেরাজউদ্দিন স্ত্রীর সঙ্গে চোখাচোখি করলেন। হাসপাতাল, থানা কোথাও যখন শুভ্রর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রেহানা টিভি চ্যানেলগুলিতে শুভ্রর ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। শুভ্র ফিরে আসার উত্তেজনায় বিজ্ঞাপন বন্ধের কথা ভুলে গেছেন।



আজহার অফিসে যান নি। গতকাল রাতে দু'বার খাওয়ায় শরীর বিগড়ে গেছে। ঘনঘন বাথরুমে যেতে হচ্ছে। অ্যাসিডিটিতে বুক জ্বলে যাচ্ছে। দুধ খেলে অ্যাসিডিটির আরাম হয়। যুথী মোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট মিল্কভিটা নিয়ে এসেছে। তিনি পুরোটা খেয়ে কিছুক্ষণ আগে বমি করেছেন। বমির পর মাথা ঘুরছে। এই উপসর্গ দুধ খাওয়ার আগে ছিল না। আজহার যুথীকে বললেন, আমি তো মনে হয় মারা যাচ্ছিরে মা।

যুথী বাইরে যাবে। শাড়ির কুচি ঠিক করতে করতে নির্বিকার গলায় বলল, এত সহজে কেউ মারা যায় না বাবা।

আজহার বললেন, মানুষ সহজেই মারা যায়। আলেকজান্ডারের মতো মহাবীর ইলিশ মাছ খেয়ে মারা গেছে। কাল রাতে তোর বান্ধবীর বাড়ি থেকে যে খাবার এসেছে, সেখানে ইলিশ মাছের আইটেম ছিল। স্মোকড হিলসা। আমি ঐ আইটেমটাই বেশি খেয়েছি।

মহাবীর আলেকজান্ডারের ইলিশ মাছ খেয়ে মৃত্যুর গল্প আজহার তাঁর বস ইমতিয়াজ সাহেবের কাছে শুনেছেন। ইমতিয়াজ সাহেব সুন্দর সুন্দর গল্প করেন। তাঁর সব গল্পই আজহার সুযোগমতো ব্যবহার করেন।

যুথী বলল, বেশি খেলেও তুমি মরবে না বাবা। কারণ তুমি মহাবীর আলেকজান্ডার না। তুমি কাপুরুষদের একজন।

সালমা মাছ কুটছিলেন। মাছ ফেলে উঠে এসে বললেন, এইসব কী ধরনের কথা ? বাজারের নটিরাও তো বাপের সঙ্গে এইভাবে কথা বলে না।

যুথী বলল, বাজারের নটিদের বাবারা নটিদের সঙ্গে বাস করে না। কাজেই নটিরা এ ধরনের কথা বলে না।

আজহার বললেন, বাদ দাও। কথা চালাচালি বন্ধ। তুই যাচ্ছিস কোথায় ?

চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি।

কিসের চাকরি ? কী ইন্টারভিউ ? আমি তো কিছুই জানি না।

সবকিছু তোমাকে জানতে হবে ?

অবশ্যই। আমি এই সংসারের প্রধান। আমাকে সবকিছু জানতে হবে। তোর মা দুপুরে কী রাঁধবে তাও আমি জানব।

তোমার সবকিছু জানার দরকার নেই।

আজহার মেয়েকে কঠিন কিছু কথা বলার প্রস্তুতি নিলেন। কথাগুলি বলতে পারলেন না। তাঁকে অতি দ্রুত বাথরুমে ঢুকতে হলো। যুথী তার মাকে বলল, মা যাই। দোয়া করো যেন চাকরিটা হয়।

সালমা বললেন, কিসের চাকরি ?

যুথী বলল, এখনো জানি না কিসের চাকরি। বেতন অনেক। কুড়ি হাজার টাকা। কোম্পানির গাড়ি এসে নিয়ে যাবে, দিয়ে যাবে।

বলিস কী!

যাই মা।

সালমা বললেন, এত বড় একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছিস, বাবা-মা'কে কদমবুসি করে দোয়া নিবি না ?

চাকরি হোক তারপর কদমবুসি করব। কদমবুসি করলাম তারপর কিছুই হলো না—কদমবুসি মাঠে মারা গেল। এটা তো ঠিক না।

যুথী বের হয়ে গেল। বাথরুম থেকে আজহার ডাকছেন, যুথী, পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা কর। জাস্ট ফাইভ মিনিটস।

যুথী চলে যাবার আধঘণ্টার মধ্যে গিফটর‍্যাপে মোড়া বিশাল প্যাকেট এসে উপস্থিত। সঙ্গে মুখবন্ধ খাম। খামের ওপর লেখা 'মিস যুথী'।

আজহার খাম হাতে নিয়ে বললেন, একটা ধারালো ব্লেড আনো। চিঠিতে কী লেখা দেখি।

সালমা বললেন, যুথীর চিঠি তুমি পড়লে ও খুব রাগ করবে।

রাগ করলেও চিঠি পড়তে হবে। কোথায় কী চিঠি চালাচালি হচ্ছে জানতে হবে না ? তাছাড়া যুথী কিছু জানতে পারবে না। খাম এমনভাবে খুলব যে ডিটেকটিভ শার্লক হোমস সাহেবও ধরতে পারবেন না। চুলায় পানি দিয়ে কেতলি বসাও।

কেন ?

আজহার বললেন, কেতলির মুখ দিয়ে স্টিম বের হবে। খামটা স্টিমে ধরলে গাম নরম হবে। তখন ব্লেড দিয়ে খুলব। চিঠি পড়া শেষ হলে আগের মতো লাগিয়ে রাখা হবে। ক্লিয়ার ?

আজহার চিঠি খুলে পড়লেন। চিঠিতে লেখা—

যুথী,

আমার ছেলে শুভ্র বিপদে পড়েছিল। তাকে তুমি সাহায্য করেছ। তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। সামান্য কিছু ফল পাঠালাম। গ্রহণ করলে খুশি হব।

ইতি

শুভ্রর মা।

আজহার বললেন, শুভ্রটা কে?

সালমা বললেন, জানি না কে।

তুমি তার মা। তুমি কিছুই জানো না?

আমাকে না বললে জানব কীভাবে?

তুমি অতি মূর্খ একজন মহিলা। মূর্খশ্রেষ্ঠ। মেয়ের সঙ্গে মায়ের থাকবে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক। যেন মেয়ে পেটে কথা রাখতে না পারে। রাতে এক বিছানায় মা-মেয়ে শোবে। মেয়ে গুনগুন করে সব কথা বলবে। তুমি সময়মতো আমাকে জানাবে। তা-না, সন্ধ্যা হতেই ঘুম। বুদ্ধির কোনো নাড়াচাড়া আমি তোমার মধ্যে দেখলাম না। অপদার্থ মেয়েছেলে!

গালাগালি করছ কেন?

গালাগালি করছি কারণ গালাগালি তোমার প্রাপ্য। চিঠি পড়ে তো আমার গায়ের রক্ত পানি হবার উপক্রম হয়েছে। শুভ্র মহাবিপদে পড়েছে, এমনই বিপদ যে উদ্ধারের পর তার মা একগাদা ফল পাঠিয়েছে। আর উদ্ধার কে করেছে? তোমার মেয়ে। আমি নিশ্চিত ড্রাগঘটিত কিছু। শুভ্র ড্রাগ চালাচালিতে পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছিল। তোমার মেয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে হাতে-পায়ে ধরে তাকে ছাড়িয়ে এনেছে। তোমার মেয়ে তো কথার রানি। ও কি তার ঘর তালা দিয়ে গেছে?

হুঁ।

এইটাও তো একটা কথা, যখনই বাইরে যাবে ঘর তালা দিয়ে যাবে কেন? এমন কী আছে ঘরে যা কেউ দেখতে পারবে না? আমি তালা খোলার লোক নিয়ে আসছি। তালা খুলে আজ তার ঘর চেক করা হবে।

তোমার শরীরটা খারাপ। শুয়ে থাকো। অন্য কোনোদিন তালা খোলা হবে।

আজহার শার্ট পরতে পরতে বললেন, এইসব জিনিস দেরি করতে নাই। কুইক অ্যাকশানে যেতে হয়। শরীর খারাপের আমি কেঁথা পুড়ি।

ইন্টারভিউ বোর্ডে সাধারণত বেশ কয়েকজন থাকেন। এখানে বোর্ডে একজনই আছেন। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। স্যুট-টাই পরা না। হালকা সবুজ রঙের টিশার্ট পরা। ভদ্রলোকের চুল কোঁকড়ানো। চেহারা সুন্দর। তাঁর সামনে কোনো ফাইলপত্র নেই। আছে কোনো একটা গল্পের বই। ইন্টারভিউ নেওয়ার চেয়ে গল্পের বই পড়ার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ বেশি দেখা যাচ্ছে। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বইও পড়ছেন। তাঁর নাম আহসান। তিনি চিকেন ফেদার কোম্পানির সর্বেসর্বা। চেয়ারম্যান সাহেবের ঘরটাও খুব সুন্দর। দেয়ালে তিনটা পেইনটিং। প্রতিটাই সুন্দর। একটা পেইনটিং-এ গ্রামের মেয়ে ঘোমটা দিয়ে তাকিয়ে আছে। এটা এত সুন্দর যে যুথীর চোখ বারবার সেখানে চলে যাচ্ছে।

আহসান বললেন, বিএসসি অনার্স পাশ করেছেন। রেজাল্টও বেশ ভালো। প্রথম শ্রেণী। এমএসসি শেষ করলেন না কেন? কারণটা কি আর্থিক?

জি।

অনার্সে সাবজেক্ট কী ছিল?

ম্যাথমেটিকস।

ইন্টারেস্টিং।

ইন্টারেস্টিং কেন?

মেয়েরা সাধারণত অঙ্কের দিকে যায় না। তারা সাইকোলজি, সাহিত্য, এইসব পড়ে। মেয়েদের ছোট করার জন্যে বলছি না। এটাই জেনারেল ট্রেন্ড। ভুল বললে সরি।

যুথী বলল, স্যার ভুল বলেন নি।

ভদ্রলোক বললেন, বাংলা সাহিত্যের এক দিকপাল ছিলেন অঙ্কের ছাত্র। তাঁর নাম জানেন?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভেরি গুড। তাঁর কোনো বই পড়েছেন?

দু'টা বই পড়েছি—*পুতুল নাচের ইতিকথা* আর *জননী*। আমার এক বান্ধবী আছে, তার নাম নীপা। সে খুব বই পড়ে। নীপা যেসব বই আমাকে পড়তে দেয়, আমি তা-ই পড়ি।

আপনি যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম বলতে পারেন, আমি আপনাকে চাকরি দিয়ে দেব। বলতে পারবেন?

নাম বলতে না পারলে চাকরি পাব না?

না।

যুথী বলল, এই চাকরির সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক কী ?

কোনো সম্পর্ক নেই। এই মুহূর্তে আমি উনার একটা বই পড়ছি বলে এরকম সিদ্ধান্ত নিলাম।

যুথী বলল, উনার আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কনগ্রাচুলেশনস।

ভদ্রলোক বোতাম টিপলেন। এবার স্যুট-টাই পরা একজন ঢুকলেন। আহসান বই থেকে মুখ না তুলে বললেন, জহির, এই মেয়েটির নাম যুথী। সে আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করছে। অফিস এক্সিকিউটিভ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করার ব্যবস্থা করুন।

জয়েনিং ডেট কবে স্যার ?

সামনের মাসের এক তারিখ।

জহির যুথীর দিকে তাকিয়ে বলল, ম্যাডাম আসুন আমার সঙ্গে।

যুথীর সবকিছু স্বপ্নের মতো লাগছে। এটা কেমন চাকরির ইন্টারভিউ ? এত বড় একটা কোম্পানি চলবে খামখেয়ালিভাবে ? যুথী কী জানে বা জানে না এই সম্পর্কে এরা তো কিছুই জানে না। বর্তমান সময়ের কাজের প্রধান যে বিষয় কম্পিউটার জানা তাও সে জানে না। ইংরেজিতে সে খুবই কাঁচা। কারও সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালানো তার জন্যে অসম্ভব ব্যাপার।

জহির বলল, ম্যাডাম! এইটা আপনার রুম। একটু অগোছালো আছে। আজ দিনের মধ্যেই গুছিয়ে দেওয়া হবে। আপনার পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্টের নাম গফুর। সে বিরাট ফাঁকিবাজ। তাকে সবসময় ধমকের ওপর রাখবেন।

আমার আগে এখানে কে বসতেন ?

শর্মি ম্যাডাম বসতেন। উনি ছিলেন কম্পিউটারের জাদুকর। যে-কোনো প্রবলেম নিমিষে Solve করতে পারতেন।

উনার চাকরি কি নেই ?

গত মাস থেকে তাঁকে অফ করা হয়েছে।

কেন ?

ম্যাডাম জানি না কেন! চা খান, চা দিতে বলি ?

বলুন।

আমি দশ মিনিট পর কাগজপত্র রেডি করে নিয়ে আসব।

যুথী তার ঘরে বসে আছে। ঠান্ডা ঘর। এসি চলছে। বিজবিজ করে এসির শব্দটা এমন অদ্ভুত লাগছে। যুথীর এখন মনে হচ্ছে, এটা কোনো স্বপ্ন। মাঝে

মাঝে সে নিখুঁত স্বপ্ন দেখে। একবার স্বপ্নে দেখল, বাসে করে যাচ্ছে। তার পাশেই বুড়োমতো এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের কোলে পাঁচ-ছয় বছরের একটা মানসিক প্রতিবন্ধী ধরনের মেয়ে। সে হা করে আছে। তার মুখ থেকে ক্রমাগত লালা পড়ছে। মেয়েটা হুঁ হুঁ হুঁ করে শব্দ করছে এবং লালা মাখানো হাত দিয়ে যুথীকে ধরার চেষ্টা করছে। অতি বাস্তব ধরনের স্বপ্ন।

নিজের অফিসঘরে সে বসে আছে—এটাও নিশ্চয় সেরকম স্বপ্ন। এক্ষুনি বাবার কাশির শব্দে ঘুম ভাঙবে। প্রতিদিনই যুথীর ঘুম ভাঙে বাবার কাশির শব্দে। ঘুম ভাঙার পর তিনি ঘণ্টাখানিক কেশে শরীরের কলকব্জা ঠিক করেন। বাকি দিন আর কাশেন না।

যুথী টেলিফোন করে তার চাকরি পাওয়ার খবর নীপাকে দিল। নীপা বলল, এক কথায় চাকরি দিয়ে দিল ? ব্যাটার অন্য কোনো মতলব নাই তো ?

অন্য কী মতলব ?

হয়তো চাকরির অলিখিত শর্ত, সে যখন দেশের বাইরে যাবে তোকেও সঙ্গে যেতে হবে।

আমাকে সঙ্গে যেতে হবে কেন ?

ঘুমপাড়ানো মাসিপিসি হিসেবে যেতে হবে। রাতে বসের ঘুম আসছে না। তুই যাবি, বসের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তাকে ঘুম পাড়াবি।

কী বলছিস এইসব!

ঠাট্টা করছি। আজ সন্ধ্যায় বাসায় চলে আয়, আমরা সেলিব্রেট করব। করিম আংকেলও আসবেন। তাঁর মাথায় নতুন এক আইডিয়া এসেছে। তিনি আইডিয়া শোনাবেন। তুই অবশ্যই আসবি। ঠিক আছে ?

হ্যাঁ ঠিক আছে।

গাড়ি পাঠাব ?

গাড়ি পাঠাতে হবে না।

যুথী! তুই কি সত্যি চাকরি করবি ?

হুঁ।

M.Sc. শেষ করবি না ?

না।

সেকেন্ড থট দিবি ?

না।

যুথী টেলিফোন রেখে দিল। গফুর যুথীর জন্যে চা এনে কাচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনার নাম গফুর ?

জি ম্যাডাম।

যুথী কিছুক্ষণ গফুরের দিকে তাকিয়ে রইল। একে সে যখন-তখন ধমকাতে পারবে, এই চিন্তাটাও আনন্দদায়ক।

আজহার মেয়ের ঘরের তালা খুলে পুরো ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। একটা ডায়েরি পাওয়া গেছে। সেই ডায়েরি তিনি নিয়ে এসেছেন। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে গোপনে এই ডায়েরি পড়তে হবে। এর মধ্যে মেয়ে যদি ডায়েরির খোঁজ করে তিনি বলবেন, তোর ডায়েরির বিষয়ে আমরা জানব কী করে ? তুই তো তোর ঘর তালা দিয়েই রাখিস।

যুথী বাসায় ফিরল বিকেল চারটায়। আজহার বসার ঘরের সোফায় পা তুলে বসা। মনে হচ্ছে মেয়ের ফেরার অপেক্ষায় আছেন। সালমাও স্বামীর পাশে বসা। আজহার যতক্ষণ বাসায় থাকেন এই মহিলা চেষ্টা করেন স্বামীর আশেপাশে থাকতে।

যুথী বলল, তোমার শরীরের অবস্থা কী বাবা ?

শরীর ভালো। কে যেন তোকে একটা চিঠি দিয়েছে। আর একটা বক্স পাঠিয়েছে। ব্যাপার কী বল তো ? আগে চিঠিটা পড়।

যুথী চিঠি পড়ল।

আজহার বললেন, চিঠিতে কী লেখা ?

যুথী বলল, চিঠিতে কী লেখা তুমি জানো বাবা। তুমি চিঠি খুলে পড়েছ। তারপর খামের মুখ বন্ধ করে রেখেছ। কীভাবে বুঝলাম জানতে চাও ? চিঠি থেকে ভকভক করে বিড়ির গন্ধ আসছে। যে ভদ্রমহিলা চিঠি লিখেছেন তিনি নিশ্চয়ই বিড়ি খান না।

সালমা বললেন, বাবার সম্পর্কে হুট হাট কথা বলবি না মা। তোর বাবা খাম হাতে নিয়েছিল, সেখান থেকে বিড়ির গন্ধ পাচ্ছিস।

যুথী বলল, মা, আমি চিঠিটা তোমার হাতে দিচ্ছি তুমি শুঁকে দেখো। খাম না, শুধু চিঠি।

আজহার দুঃখিত গলায় বললেন, সালমা, তোমার মেয়ের মাথা খারাপ হয়েছে। টোটাল মস্তিষ্কবিকৃতি। ওর কথা ধরে মন খারাপ করার কিছু নাই। ফল কে পাঠিয়েছে তোমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করো। আমি ঠিক করেছি, বাকি জীবন আর সরাসরি তোমার মেয়ের সঙ্গে কোনো কথা বলব না।

যুথী বলল, ফল পাঠিয়েছে তুমি বুঝলে কী করে ? তুমি তো চিঠি পড়ো নি।

সালমা বললেন, ভকভক করে ফলের গন্ধ এসেছে, সেখান থেকে তোর বাবা বুঝেছে।

আজহার বললেন, এই মেয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করা মানে সময়ের অপচয়। আমি শোবার ঘরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। সালমা, যদি সম্ভব হয় আমাকে এককাপ আদা চা দিয়ো।

আজহার উঠে চলে গেলেন। যুথী মা'র পাশে বসতে বসতে বলল, সবসময় তুমি বাবার লেজ ধরে থাকো কেন মা ? নিজের স্বাধীন চিন্তাভাবনা থাকবে না ? বাবাকে আড়াল করে রাখার এই অভ্যাসটা খুব খারাপ। বাবাকে যখন চা দিচ্ছ আমাকেও এককাপ দিয়ো। আমার মাথা ধরেছে। আমি কিছুক্ষণ বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকব।

সালমা উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। তাঁর বুক ধ্বক ধ্বক করছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি যুথী চেঁচিয়ে বলবে, আমার ঘরের তালা কে খুলেছে ?

সেরকম কিছু হলো না। সালমা চা নিয়ে মেয়ের ঘরে ঢুকে ভীত গলায় বললেন, তোর বাবা ডাকছে। একটু শুনে যা লক্ষ্মী মা। যুথী উঠে দাঁড়াল।

যুথীকে ঘরে ঢুকতে দেখে আজহার হাসিমুখে বললেন, যুথী মা বোস। যেন একটু আগের ঘটনা তাঁর কিছুই মনে নেই। যুথী বসল।

আজহার বললেন, ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলি, সেই বিষয়ে তো কিছুই শুনলাম না। ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে ?

খারাপ।

কোয়েশ্চেনের আনসার করতে পারিস নাই ?

না।

কোয়েশ্চেন কী করেছে ?

জিজ্ঞেস করেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালো নাম কী ?

এটা আবার কী রকম প্রশ্ন! এই হিন্দুটা কে ?

একজন লেখক।

হিন্দু লেখক তো একজনই—শরৎ বাবু। উনার একটা বই আছে, নাম 'চরিত্রহীন'। ক্লাস নাইনে জিওগ্রাফি ক্লাসে এই বই পড়ে শেষ করেছিলাম। লাস্ট পাতা পড়তে গিয়ে ধরা খেলাম। চোখের পানি মুছছি, আজিজ স্যার বললেন, কী বই পড়ছিস ?

আমি বললাম, জিওগ্রাফি বই স্যার।

স্যার বললেন, জিওগ্রাফি বই পড়ে কাঁদছিস কেন ? দেখি বই নিয়ে আয়।

বই নিয়ে গেলাম। শুরু হলো শাস্তি। আমাদের সময় শাস্তি ছিল মারাত্মক। পেটে পেন্সিল দিয়ে ডলা। আজকাল শাস্তি উঠে গেছে, শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাও উঠে গেছে।

যুথী বলল, বাবা, তোমার কথা শেষ হয়েছে ? আমি উঠি।

আজহার বললেন, ছোট্ট একটা কথা বাকি আছে মা। ইন্টারভিউ নিয়ে মন খারাপ করবে না। Next কোনো ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে আমার কাছে পরামর্শ নিবে। ইন্টারভিউ বোর্ডের কিছু আদবকায়দা আছে। আমি শিখিয়ে দিব। যেমন, সালাম দিয়ে ঢুকবে। ঢুকেই চেয়ার টেনে বসে পড়বে না। মিষ্টি করে বলবে, স্যার আমি কি বসব ? তোমাকে বসতে বলার পর শব্দ করে চেয়ার টানবে না। শব্দ হয় না এমনভাবে চেয়ার টেনে বসবে। আবারও মিষ্টি করে হেসে বলবে, স্যার ধন্যবাদ। বুঝতে পারছ কী বলছি ?

পারছি।

যুথী মা। এখন সর্বশেষ কথা। আমাদের নবী-এ-করিমের একটা হাদিস। তিনি বলেছেন, আল্লাহপাক ছাড়া আমি যদি আর কাউকে সেজদার হুকুম দিতাম তাহলে পিতাকে সেজদার হুকুম দিতাম।

যুথী বলল, যেহেতু নবী পিতাকে সেজদার হুকুম দেন নি, তোমাকে সেজদা করছি না।

যুথী বের হয়ে গেল। আজহার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সালমা স্বামীর পিঠে হাত রেখে বললেন, মন খারাপ করো না।

আজহার বললেন, আমি মন খারাপ করছি না। সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করছি। আর শোনো, তুমি যখন-তখন আমার গায়ে হাত দিবে না এবং সারাক্ষণ ঘেঁসাঘেঁসি করবে না। তোমার গা থেকে কড়া রসুনের গন্ধ আসে, এটা জানো ? এখন থেকে ভালোমতো সাবান ডলে গরম পানি দিয়ে গোসল করবে।

আচ্ছা।

আজহার গলা নামিয়ে বললেন, মেয়ের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করো। তার পেট থেকে কথা বের করো। শুভ্র কে ? শুভ্র কী বিপদে পড়েছিল ? এইসব। তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। ক্লিয়ার ?

কলিংবেল বাজতে শুরু করেছে। সালমা দরজা খোলার জন্যে উঠলেন। আজহার স্ত্রীর পেছনে পেছনে গেলেন। কেন জানি তাঁর মনে হয়েছে বাড়িতে পুলিশ এসেছে। শুভ্রর কোনো ব্যাপারেই এসেছে। বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

দরজা খুলে দেখা গেল টুনু এসেছে। তার সঙ্গে একগাদা জিনিসপত্র। চাল এনেছে দুই বস্তা। মাষকলাইয়ের ডাল দশ কেজি। দু'টা লাউ দু'টা কুমড়া। পাট শাক, সজিনা। কেরোসিনের একটা টিন দেখা যাচ্ছে। টিনের মুখ খোলা।

আজহার বললেন, টিনের ভেতর কী ?

টুনু বলল, জিয়ল মাছ বাবা।

আজহার বললেন, গুড। ভেরি গুড। ঐ পুঁটলার ভেতর কী ?

কাঁচামরিচ আর লেবু। বড় চাচা বললেন, এবারের কাঁচামরিচে ঝাল বেশি হয়েছে নিয়ে যা।

টাকাপয়সা কিছু দিয়েছেন ?

এগারো হাজার সাতশ' টাকা দিয়েছেন।

বলিস কী ?

গত বছরের ধান বেচা কিছু টাকা ছিল। সেটা নিয়ে এগারো হাজার সাতশ' হয়েছে।

ভাইজানের শরীর কেমন ?

শরীর বেশি ভালো না। হাঁটাচলা তেমন করতে পারেন না। সম্পত্তি ভাগাভাগি করে দিতে চান। তোমাকে যেতে বলেছেন।

আজহার আনন্দিত গলায় বললেন, এই হলো আদর্শ বড়ভাই। পিতৃতুল্য। অন্যকেউ হলে সম্পত্তি মেরে দেয়ার তালে থাকত। ঠিক না সালমা ?

অবশ্যই ঠিক।

আজহার বললেন, ভাইজানকে কিছুদিন আমার এখানে এনে রাখতে চাই। কিছুদিন সেবা-যত্ন করলাম। ভালো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করলাম। সালমা কী বলো ?

সালমা বললেন, বলাবলির তো কিছু নাই। তুমি গিয়ে উনাকে নিয়ে আসো।

অফিসে ছুটির দরখাস্ত করব। ছুটি পেলেই উনাকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসব। তুমি একটা গামলা আনো। গামলায় মাছ ঢেলে গুনে দেখি কয়টা। ডিমওয়ালা কয়েকটা শিং মাছ রান্না কোরো। ডিম আলাদা ভুনা করবে।

টুনু যুথীর ঘরে ঢুকল। টুনু বলল, শুয়ে আছিস কেন ?

যুথী বলল, মাথার যন্ত্রণা। ভাইয়া, তোকে চাষার মতো দেখাচ্ছে।

টুনু বলল, চাষার মতো দেখানোরই কথা। এতদিন চাষবাসই করেছি। লাউ-কুমড়ার বীজ লাগিয়েছি। ডাঁটা বুনেছি। ট্রাক্টর ভাড়া করে দু'টা ক্ষেত চাষ দিয়েছি। খুবই ইন্টারেস্টিং। আমি নিজেই ট্রাক্টর চালিয়েছি।

গ্রামে ট্রাক্টর ভাড়া পাওয়া যায় ?

পাওয়া যায়। এখনকার গ্রাম আর আগের গ্রাম না। তোর খবর কী ?

আমি বিরাট একটা চাকরি পেয়েছি।

সত্যি!

এখনও স্বপ্ন মনে হচ্ছে। তবে সত্যি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার টেবিলে রাখা আছে।

তোর কাজ কী ?

কাজ কী জানি না। পোস্টের নাম অফিস এক্সিকিউটিভ। কুড়ি হাজার টাকা বেতন। ভাইয়া, মাথা টিপে দে।

টুনু আয়োজন করে মাথা টিপতে বসল। যুথীর ঘুম এসে যাচ্ছে, সে কষ্ট করে জেগে আছে। ঘুমিয়ে পড়লে আরামটা পাওয়া যাবে না। টুনু বলল, গ্রাম থেকে একটা খবর শুনে এসেছি। বাবাকে খবরটা দেব কি না বুঝতে পারছি না।

কী খবর ?

বড় চাচা না-কি আমাদের সব সম্পত্তি জাল দলিল-টলিল করে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন।

খবর দিয়েছে কে ?

মেম্বার কুদ্দুস বলেছেন। আরো কয়েকজন বলেছেন। বাবাকে কি বলব ?

যুথী বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, না। বাবা তাঁর বড়ভাইকে দেবতার মতো দেখেন। ঘটনা সত্যি হলে বাবা যে শক পাবে, সেই শকেই মারা যাবে।

একদিন তো জানবেনই।

যখন জানবেন তখন জানবেন। এখন ঝামেলা করে লাভ নাই।

আজহার মাছ গোনা শেষ করেছেন। আঠারোটা কই মাছ। এদের মধ্যে পাঁচটা বেশ বড়। শিং মাছ আছে বাইশটা। সবই মাঝারি সাইজের। আজহার বললেন, ভাইজানের শরীরটা খারাপ শোনার পর থেকে মনটা অস্থির হয়ে আছে। কী করি বলো তো ?

একটা মুরগি সদগা দিয়ে দাও।

গুড আইডিয়া। মসজিদে একটা মিলাদও দিয়ে দেই।

দাও।

তোমার গুণবতী মেয়েকে ডেকে আনো। দেশ থেকে কী এসেছে একটু দেখুক। দেখার মধ্যেও তো আনন্দ। সে রাতে কী খেতে চায় জিজ্ঞেস করো। সেই মতো রান্না করো।

সালমা বললেন, ও রাতে খাবে না। তার বান্ধবী নীপার বাড়িতে রাতে খাবে।

নিষেধ করো। দু'দিন পর পর দাওয়াত খাওয়া আমার অত্যন্ত অপছন্দ। টুনু এতদিন পরে এসেছে, সবাই রাতে একসঙ্গে খাব। ভালো কথা, ফলের বাক্সটা তো খোলা হয় নাই ?

না।

খোলো। দেখি কী আছে। তোমার কাজের কোনো সিস্টেম নাই।

ফলের বাক্স খুলে আজহার মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দেশী ফল একটাও না। সবই বিদেশী। এর মধ্যে কয়েকটা ফল তিনি চিনতেই পারলেন না। তিনি বললেন, সালমা, আমার মোবাইল টেলিফোনটা আনো, ছবি তুলে রাখি। তুমি এই ফলটা হাতে নিয়ে বসো। আমি ছবি তুলে দেই।

ফলটার নাম কী ?

নাম জানি না। এইজন্যেই তো ছবি তুলছি। স্যারকে ছবি দেখাব। উনি নাম বলে দেবেন। অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ। অহঙ্কার একেবারেই নাই। আমার ভাইজানের সঙ্গে উনার চেহারার মিলও আছে। প্রায়ই ভাবি, দাওয়াত করে উনাকে খাওয়াব।

দাওয়াত করলেই পার।

এই সপ্তাহেই করি। কী বলো ?

আজহার ফলের চারটা ছবি তুললেন। একটা তুললেন নিজের ছবি। সালমাকে দিয়ে তোলালেন। এই ছবিতে তিনি একটা স্ট্রবেরি নিয়ে মুখের সামনে ধরে আছেন।

রেহানা শুভ্রর কিছু কর্মকাণ্ড মোটেই বুঝতে পারছেন না। শুভ্রর ঘরে ঝকঝকে নতুন একটা হারমোনিয়াম। একটা বয়সে যুবকদের গানবাজনার শখ হয়। তারা হারমোনিয়াম কেনে না। গিটার কিংবা কি-বোর্ড পর্যন্ত যায়। অতি দ্রুত গানবাজনার শখের মৃত্যু ঘটে।

তিনি শুভ্রকে ডেকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করতে পারেন, তোমার ঘরে হারমোনিয়াম কেন ?

জিজ্ঞেস করতে মন সায় দিচ্ছে না। শুভ্র নিজ থেকে কেন বলবে না ? কেন তার মধ্যে লুকাছাপা চলে এসেছে ? হারমোনিয়াম সে চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে, এর অর্থ সে আড়াল করতে চাইছে।

বিকেলে চা খেতে শুভ্র ছাদে যায়। চায়ের কাপটা থাকে ছাদের মাঝামাঝি জায়গায় রাখা শ্বেতপাথরের বেদিতে। শুভ্র ছাদের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় দ্রুত হাঁটাহাঁটি করে। মাঝে মাঝে বেদির কাছে এসে চায়ে চুমুক দেয়। শুভ্র এই হাঁটাহাঁটির নাম দিয়েছে 'চিন্তাচিন্তি'। হাঁটতে হাঁটতে সে নাকি চিন্তা করে।

রেহানা ছেলের খোঁজে ছাদে এলেন। শুভ্র হাঁটাহাঁটি করছে না। বেদিতে বসে আছে। হাতে চায়ের কাপ। রেহানা বললেন, হাঁটাহাঁটির পর্ব শেষ না-কি ?

শুভ্র জবাব দিল না। মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল।

রেহানা বললেন, দেখি তোমার কাপ থেকে এক চুমুক চা খাই।

শুভ্র মা'র হাতে চায়ের কাপ তুলে দিল। রেহানার সুচিবায়ুর মতো আছে। কিন্তু ছেলের চায়ের কাপে এক চুমুক দিতে কিংবা তার পেপসির গ্লাসে এক চুমুক দিতে তাঁর ভালো লাগে। এটা তার পুরনো অভ্যাস।

তোমার ঘরে একটা হারমোনিয়াম দেখলাম। কিনেছ ?

হুঁ।

হারমোনিয়াম দিয়ে কী করবে ?

একজনকে গিফট করব মা।

রেহানা পরের প্রশ্নটা করবেন কী করবেন না বুঝতে পারছেন না। পরের প্রশ্নটা হলো, 'সেই একজনটা কে ?' শুভ্র মনে হয় সেই একজনের পরিচয় দিতে চাচ্ছে না। পরিচয় দিতে চাইলে শুরুতেই তার নাম বলত।

রেহানা হাত থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, যাকে হারমোনিয়াম গিফট করবে তাকে কি আমি চিনি ?

না। তবে তার নাম শুনেছ।

নাম জানতে পারি ?

হারমোনিয়ামটা আমি যুথীর জন্যে কিনেছি মা।

রেহানা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে। শুভ্রর হাস্যকর কাণ্ডকারখানায় গলার স্বর স্বাভাবিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। রেহানা বললেন, যুথী মেয়েটা কি তোমাকে হারমোনিয়াম কিনে দিতে বলেছে ?

না।

তাহলে তাকে হারমোনিয়াম গিফট করছ কেন ?

মা! যুথীর গলার স্বর অস্বাভাবিক মিষ্টি। আমি চাই ও গান শিখুক।

তুমি কি তার অভিভাবক ?

শুভ্র বলল, না মা, আমি ওর কিছুই না। কিন্তু আমি চাই ও গান শিখুক। আমি খুব সুন্দর একটা চিঠি তাকে লিখেছি। হারমোনিয়াম এবং চিঠিটা তাকে পাঠাব। আমার ধারণা চিঠিটা পড়লেই সে গান শিখবে।

সেই চিঠিটা কি আমি পড়ে দেখতে পারি ?

অবশ্যই পার। কেন পারবে না ? চিঠিটা আমার বুকসেলফের তিন নম্বর তাকে, বইয়ের ওপর রাখা আছে। ড্রাইভারকে দিয়ে চিঠি এবং হারমোনিয়াম পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো তো মা। আমার নিজের যেতে লজ্জা লাগবে।

তুমি কি ছাদে আরও কিছুক্ষণ থাকবে ?

সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত থাকব।

তোমাকে কি আরেক কাপ চা পাঠাব ?

পাঠাও।

রেহানা ছাদ থেকে নেমে গেলেন। শুভ্রর জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করে তিনি চিঠি পড়তে বসলেন।

> যুথী,
>
> এই হারমোনিয়ামটা আমি আপনার জন্যে কিনেছি। আগেই রেগে যাবেন না। কেন কিনেছি তা শুনুন। আপনার গলার স্বর অস্বাভাবিক মিষ্টি। আমি নিশ্চিত, অনেকেই এই কথা আপনাকে বলেছে। তবে আপনি নিজে বিষয়টা জানেন না।
>
> প্রকৃতি যখন কাউকে বড় ধরনের গিফট দিয়ে পাঠায় তখন তার উচিত বহুজনকে সেই গিফটের ভাগ দেওয়া। আপনি যদি গান শেখেন এবং গান করেন তবেই আপনার কিন্নরকণ্ঠের আনন্দ অন্যরা নিতে পারবে।
>
> প্লিজ, আমার ওপর রাগ করবেন না।
>
> শুভ্র।

শুভ্রর ড্রাইভার যখন হারমোনিয়াম এবং চিঠি নিয়ে যুথীদের বাসায় পৌঁছল তখন যুথী নেই। সে নীপার কাছে গেছে।

আজহার টুনুকে ডেকে বললেন, টুনু, ঘটনা কী ?

টুনু বলল, বাবা, আমি তো জানি না ঘটনা কী।

ঘরে হারমোনিয়াম চলে এসেছে, ব্যাপার কী ? এখন থেকে কি বাড়িতে বাদ্যবাজনা হবে ? আমার বাসাটা হবে বাইজি বাড়ি ? হারমোনিয়ামের সঙ্গে নাকি চিঠিও এসেছে ?

হ্যাঁ।

চিঠি খুলে পড়ে দেখ।

টুনু বলল, যুথীর কাছে লেখা চিঠি আমি কেন পড়ব ?

তোকে পড়তে বলছি এইজন্যে পড়বি। এটা আমার অর্ডার।

টুনু হতাশ গলায় বলল, বাবা, এটা আমি করব না।

আজহার বললেন, তুমি ষাঁড়ের গোবর ছাড়া কিছু না। প্লেইন এন্ড সিম্পল Cowdung. তিনবার ইন্টারমিডিয়েট ফেল করে এখন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াও। ঢাকা শহরে তুমি ঠেলাগাড়ি চালিয়ে জীবন কাটাবে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এখন আমার চোখের সামনে থেকে বিদায় হও। স্টুপিড কোথাকার!

টুনু মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল। আজহার খাম খোলার প্রস্তুতি নিলেন। তবে এবার ভুল করলেন না, সাবান দিয়ে বেশ কয়েকবার হাত ধুয়ে নিলেন। যেন চিঠিতে বিড়ির গন্ধ লেগে না থাকে।

করিম আংকেল যুথীর চাকরি পাওয়া সেলিব্রেট করার জন্যে শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে খুলতে বললেন, বিশেষ কোনো ঘটনা সেলিব্রেট করার জন্য আছড়ে নারিকেল ভাঙার প্রথা ছিল। পশ্চিমা দেশে নারিকেলের পরিবর্তে শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হয়। যুথী, তুমি যদি গ্লাসে একটা চুমুক না দাও তাহলে সেলিব্রেশন সম্পন্ন হবে না।

শ্যাম্পেনের গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালা হয়েছে। চারজন মানুষ চারটা গ্লাস। নীপা, যুথী, করিম আংকেল এবং যমুনা।

নীপা বলল, যুথী যখন খেতে চাচ্ছে না ওকে জোর করার কিছু নেই, ও খালি গ্লাসেই চুমুক দিক।

করিম আংকেল বললেন, তা তো হবে না।

নীপা বলল, আমি নারিকেল আনার ব্যবস্থা করছি। নারিকেল ভাঙা হোক।

যুথী কিছু না বলে একটা শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে নিয়ে চুমুক দিল।

করিম আংকেল বললেন, খেতে কেমন লাগছে বলো ?

যুথী বলল, তেঁতুলের পানির মতো লাগছে।

করিম আংকেল গ্লাস উঁচু করে বললেন, যুথীর চাকরি পাওয়া উপলক্ষে 'উল্লাস' অর্থাৎ Cheers.

যুথী ছাড়া সবাই বলল, চিয়ার্স! যুথী গ্লাসে দ্বিতীয় চুমুক দিল।

নীপা বলল, যুথীকে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করে হুট করে চাকরি কেন দিল ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। করিম আংকেল, আপনার কী ধারণা ?

করিম আংকেল বললেন, যে চাকরি দিয়েছে সে যে-কোনো কারণেই যুথীর প্রতি প্রবল শারীরিক আকর্ষণ অনুভব করেছে। বডি কেমিস্ট্রি কাজ করেছে। আর কিছু না।

নীপা বলল, ভদ্র কথা বলুন করিম আংকেল।

এরচেয়ে ভদ্রভাবে বিষয়টা বলা অসম্ভব। যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যে চাকরি হয়েছে তিনিও এরচেয়ে ভদ্রভাবে বলতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়তো পারতেন। তিনি বলতেন, যুথীকে দেখিয়া উনার শরীর জাগিয়া উঠিল। বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।

যমুনা বলল, শ্যাম্পেন খেতে ভালো লাগছে না। আমি হুইস্কি খাব।

করিম আংকেল বললেন, হুইস্কির বোতল যথাসময়ে খোলা হবে। তার আগে আমি যে বিশেষ কথাটি বলতে চাচ্ছি তা বলে ফেলি। আমি একটা ছবি বানাব। ফুল লেংথ ফিচার ফিল্ম। ছবির নাম 'গুহামানব'। পাইপের ভেতর বাস করে এমন কিছু নরনারীর দিবারাত্রির কাব্য। সবাই বলো, উল্লাস।

সবাই 'উল্লাস' বলল।

আজহার দরজা বন্ধ করে যুথীর ডায়েরি নিয়ে বসেছেন। প্রথম পাতায় তারিখ দিয়ে লেখা—

> করিম আংকেল আজ আমাকে মদ খাওয়ানোর জন্যে অনেক ঝুলাঝুলি করলেন। যে এই জিনিস খায় না তাকে এত পীড়াপীড়ি কেন! আমাকে বললেন, যুথী, এসো আমরা কারণ ছাড়া কারণ পান করি।
>
> আমি বললাম, কারণ জিনিসটা কী ?
>
> করিম আংকেল বললেন, কারণ হলো কারণবারি। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা মদ বলে না। বলে কারণবারি। এতে মদের দোষ কেটে যায়।

আজহার ডায়েরি বন্ধ করে ঘামতে থাকলেন। এইসব কী ? তাঁর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। তাঁর মনে হলো এক্ষুনি তিনি মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যাবেন।



আজ জুলাই মাসের এক তারিখ, সোমবার।

যুথীর অফিসে জয়েন করার তারিখ। সে হাতে ষোলদিন সময় পেয়েছিল। এই ষোলদিনে সে অনেকগুলি কাজ করেছে। New Age Computer নামের এক প্রতিষ্ঠানে এক হাজার টাকা দিয়ে নাম লিখিয়েছে। সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত ক্লাশ। তারা ছয় মাসে নাকি কম্পিউটারে ওস্তাদ বানিয়ে দেবে। নিউ এজ কম্পিউটারের মালিক আব্দুস সোবাহান কোরানে হাফেজ। তিনি বললেন, মা শুনেন। কম্পিউটার হলো মানব সন্তানের মতো। তার যত্ন করবেন। তাকে আদর করবেন। সে আদরের কাঙাল। শিশুদের যেমন পোষ মানাতে হয়, তাকেও পোষ মানাতে হবে। তারপর তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ আদায় করতে হবে।

হাফেজ সাহেবের কথাবার্তা যুথীর পছন্দ হলো। সে একদিন ক্লাশ করেছে। তার কাছে মনে হয়েছে, হাফেজ সাহেব শিক্ষক হিসেবে ভালো।

সে একজন গানের টিচারের সাথেও কথা বলেছে। তার নাম অশোক মিত্র। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান শেখান। তবলা সঙ্গে নিয়ে যান বলে ছাত্রের বড়িতে তবলা না থাকলেও সমস্যা নাই। অশোক বাবু মাসে এক হাজার টাকা নেবেন এবং সপ্তাহে একদিন শুক্রবার গান শেখাবেন এমন কথা হয়েছে। যুথীর গান শেখা এখনো শুরু হয় নি।

যুথী চারটা ছেলেমেয়েকে পড়াত। এদের প্রত্যেককে এক প্যাকেট চকলেট দিয়ে বিদায় নিল। চাকরির প্রথম বেতনের টাকা পেয়ে সে তাদের সবাইকে নিয়ে পিৎজাহাটে খাবে, এই কথা বলে এল।

চাকরিতে জয়েন করতে যাবার আগে বাবা-মা'কে পা ছুঁয়ে সালাম করল। আজহার বললেন, সোনার হরিণ সহজে ধরা যায় না। তোর ওপর মুরুব্বির দোয়া আছে বলে ধরে ফেলেছিস। চেষ্টা করবি যেন হরিণ ছুটে না যায়।

যুথীর মা শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন। আজহার বললেন, শুভযাত্রার সময় চোখের পানি ফেলছ। মূর্খামীর সীমা থাকা দরকার। কাঁদতে হয় বাথরুমে দরজা বন্ধ করে ভেউ ভেউ করো।

টুনু ট্যাক্সি ক্যাব ভাড়া করে এনেছে। প্রথমদিন ভাড়া ট্যাক্সিতে করে যুথী যাচ্ছে। আজ অফিস শেষে অফিসের গাড়ি বাসা চিনে যাবে, তখন অফিসের গাড়িতেই আসা-যাওয়া হবে। টুনু বলল, আমি তোর সঙ্গে যাই। অফিসটা দেখে আসি।

যুথী বলল, ভাইয়া আজ না। আরেক দিন। আজ আমার খুব লজ্জা লাগছে।

অফিসে পা দেওয়া মাত্র বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন। আজ তাঁর সামনে কোনো গল্পের বই নেই। চোখে চশমা। ওইদিন চোখে চশমা ছিল না। হালকা সবুজ রঙের শার্টে তাঁকে আগের দিনের চেয়েও সুন্দর লাগছে।

যুথী আপনার নাম?

জি।

ভালো আছেন?

জি স্যার ভালো আছি।

জয়েন করতে এসেছেন?

জি।

আমাদের কিছু সমস্যা হয়েছে। আপনাকে নিতে পারছি না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে উল্লেখ করা আছে, কোনো কারণ দর্শানো ছাড়া আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বাতিল করতে পারি। আপনার বায়োডাটা আলাদা রেখে দিতে বলেছি। কোনো স্কোপ হলে আপনাকে খবর দেব। বুঝতে পারছি আপনাকে অসুবিধায় ফেলেছি। সরি ফর দ্যাট।

বড় সাহেব ড্রয়ার খুলে কাগজপত্র বের করে পড়তে শুরু করলেন। হঠাৎ তাঁকে অনেক ব্যস্ত মনে হলো।

যুথী বড় সাহেবের ঘর থেকে বের হলো। তার উচিত মাথা নিচু করে কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই অফিস থেকে বের হয়ে যাওয়া। কেন জানি এই কাজটা সে করতে পারছে না। তার ইচ্ছা করছে সারা দিন অফিসে বসে থাকতে। অফিস ক্যানটিনে চা খেতে। জহির সাহেবকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে।

জহিরকে দেখা গেল। সে চট করে চোখ সরিয়ে নিয়ে করিডরের দিকে চলে যাচ্ছিল। যুথী গলা উঁচিয়ে ডাকল, জহির সাহেব!

জহির দাঁড়াল। যুথী তার কাছে এগিয়ে গেল। সহজ গলায় বলল, কেমন আছেন?

জহির বলল, জি ভালো।

মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। আমার নাম যুথী।

আমি আপনাকে চিনেছি।

আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। নিশ্চয়ই শুনেছেন ?

জি আমি জানি।

আমার পোস্টে কি কাউকে নেওয়া হয়েছে ?

আগে যিনি ছিলেন তিনি জয়েন করেছেন।

যুথী বলল, প্রচণ্ড রাগ লাগছে। কী করা যায় বলুন তো ? বড় সাহেবের অফিসঘরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া তো সম্ভব না।

আমার রুমে কিছুক্ষণ বসবেন ?

আপনার কি ধারণা আপনার ঘরে কিছুক্ষণ বসলে আমার রাগ কমবে ?

এক কাপ চা খান।

থ্যাংক য়্যু। আরেকদিন এসে চা খেয়ে যাব।

আপনাকে এক মাসের বেতন দেওয়ার কথা। এই বিষয়ে কি বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলবেন ?

না। চলুন আপনার ঘরে বসি, এক কাপ চা খাই। গফুর ভালো চা বানায়। ওকে বলুন আমাকে এক কাপ চা দিতে।

চা খেতে খেতে যুথী বলল, এই মুহূর্তে অপমানটা আমার গায়ে লাগছে না। কিন্তু বাসায় যখন ফিরব, সবাই জানবে, তখন অপমানটা গায়ে লাগবে। অভাবী সংসার তো। কুড়ি হাজার টাকা বেতনের চাকরি অনেক বড় ব্যাপার। সোনার হরিণের চেয়েও বেশি। প্লাটিনাম হরিণ।

জহির বলল, মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন ? ঠিকানা দেব ?

যুথী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, না। আমি আরেক কাপ চা খাব।

দু'কাপ চা পুরোপুরি শেষ করে যুথী উঠল। সে ঠিক করল আজ সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরবে না। সারাদিন পথে পথে ঘুরবে। পার্কে বসে বাদাম খাবে। হাফ প্লেট চটপটি খাবে।

গফুরকে দশ টাকা বখশিশ দিয়ে যুথী বের হলো। গফুর অত্যন্ত বিরক্ত হলো। এত কম বখশিশ মনে হয় তাকে এর আগে কেউ দেয় নি।

নিউ এজ কম্পিউটারে একবার যেতে হবে। টাকাটা ফেরত পাওয়া যায় কি না সেই চেষ্টা। মনে হয় না ফেরত পাওয়া যাবে। গানের টিচার বাতিল করতে হবে। পুরনো টিউশনি ফেরত পাওয়া যায় কি না সেই চেষ্টাও করতে হবে। আজ একদিনে তার অনেক কাজ।

অনেকক্ষণ ধরে কে যেন বেল টিপছে। বাসায় সালমা ছাড়া কেউ নেই। ঠিকা কাজের মেয়ে কাজ শেষ করে চলে গেছে। সম্ভবত টুনু এসেছে। সালমা দরজা খুললেন। অপরিচিত একটা মেয়ে। ষোল-সতেরোর বেশি বয়স হবে না। চামড়ার একটা স্যুটকেস আর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে ভীতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা সুন্দর। যে-কোনো কারণেই হোক ভয়ে তার চোখমুখ শুকিয়ে আছে। মনে হয় অনেকক্ষণ কেঁদেছে। চোখ ফোলা এবং লাল। মেয়েটা শাড়ি পরে এসেছে। শাড়ি খানিকটা এলোমেলো। মনে হয় শাড়ি পরায় সে অভ্যস্ত না।

সুরমা বললেন, কী চাও?

মেয়েটা বলল, ও নাই?

সুরমা বললেন, ওটা কে?

টুনু ভাই।

টুনু ভাইয়ের সঙ্গে তোমার কী?

দরকার আছে।

মেয়েটা ফুঁপিয়ে উঠল। সুরমা বললেন, আমি টুনুর মা। টুনুর সঙ্গে তোমার কী দরকার?

আমাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে। আমার কোথাও যাবার জায়গা নাই।

সালমা বললেন, টুনু তোমাকে জায়গা দিবে কী জন্যে? টুনুর সঙ্গে তোমার কী?

ওর সঙ্গে আমার কোর্টে বিয়ে হয়েছে। আগস্ট মাসের সাত তারিখ।

কী বলছ পাগলের মতো! নাম কী তোমার?

লাইলি। আমি কি আপনাকে কদমবুসি করব?

আসো ভিতরে। টুনু আসুক তখন ফয়সালা হবে।

সালমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। এইসব তিনি কী শুনছেন?

বাসা থেকে তোমাকে কে বের করে দিয়েছে? তোমার বাবা-মা?

না, আমার মামা। আমার বাবা-মা দু'জনই মারা গেছেন। আমি মামার সঙ্গে থাকি। আমি এক গ্লাস পানি খাব।

সালমা পানি এনে দিলেন। এবং মোবাইল টেলিফোনে আজহারকে ঘটনা জানালেন।

আজহার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মেয়ের পাছায় কষে একটা লাথি দিয়ে বাসা থেকে বের করে দাও। টুনু হারামজাদা বাসায় ফিরুক, আমি তাকে লাথি দিয়ে বের করব। লাইলি-মজনু খেলা আমার বাড়ির বাইরে হবে। আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি। বাসায় এসে যেন মেয়েকে না দেখি। যদি দেখি তাহলে তোমাকে বের করে দেব।

সালমা বসার ঘরে ঢুকলেন। বেতের চেয়ারে মেয়েটা বসে আছে। তার ভাবভঙ্গি মোটেই ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। লাইলি বলল, আমি আরেক গ্লাস পানি খাব।

সালমা বললেন, যত ইচ্ছা পানি খাও, তারপর বাসা থেকে চলে যাও। টুনুর বাবা আসছেন। উনি ভয়ঙ্কর রাগী মানুষ। কী করে বসেন তার নাই ঠিক।

লাইলি বলল, আমি কোথায় যাব?

সেটা তো আমি জানি না। বিয়ে করার সময় তো আমাকে জিজ্ঞেস করে বিয়ে করো নি।

ও না আসা পর্যন্ত আমি যাব না। আমার কোথাও যাবার জায়গা নাই।

টুনুর বাবা এলে কী হবে তুমি কল্পনাও করতে পারছ না।

আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে টুনু ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করি?

যা ইচ্ছা করো। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। শুধু ঘরে থাকবে না।

স্যুটকেস এবং ব্যাগটা এখানে থাকুক?

কোনো কিছুই থাকবে না।

ঘণ্টাখানিকের মধ্যে আজহার উপস্থিত হলেন। রাগে তাঁর মুখ গনগন করছে। বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। টুনুর গলা টিপে ধরতে পারলে শান্তি পেতেন। টুনুর খোঁজ নেই।

আজহার বললেন, ঘরে জিনের ডান্ডাওয়ালা একটা ছাতা আছে না? ছাতা বের করে রাখো। ঐ ডান্ডা আজ তোমার ছেলের পিঠে ভাঙব। তারপর কানে ধরে বহিষ্কার। আমার ঘাড়ে চেপে বসে থাকার দিন তার শেষ। এখন সে চরে খাবে।

সালমা বললেন, একগ্লাস লেবুর শরবত করে দেব? খুব ঘামছ।

দাও লেবুর শরবত। শরীরে বল করি। মেয়েটাকে দেখলাম। ইঁদুরের মতো মুখ।

সালমা বললেন, ইঁদুরের মতো মুখ তো না। সুন্দর চেহারা।

তাহলে কি দেবীর মতো মুখ? তুমিও কি তোমার ছেলের মতো দেবীদর্শন করে ফেললে? ঘরে বসে থেকে কী করবে! যাও দেবীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করো।

তুমি কি খেয়ে এসেছ?

না।

আবার অফিসে যাবে?

বাসায় যে অবস্থা, অফিসে কী যাব!

গোসল করে আসো। ভাত খাও। শুয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নাও।

আর রেস্ট! আমার জীবন থেকে রেস্ট উঠে গেছে।

সালমা বললেন, যুথীকে কি খবরটা জানাব?

আজহার বললেন, না। প্রথম চাকরিতে জয়েন করেছে। এখন তাকে ডিসটার্ব করা যাবে না।

আজহার সদর দরজার দিকে এগুলেন। সালমা বললেন, কোথায় যাও?

আজহার বললেন, আরেকবার দেবীদর্শন করে আসি।

সালমা ক্ষীণ গলায় বললেন, মেয়েটাকে বাসায় নিয়ে আসো। সারা দিন নিশ্চয়ই না খেয়ে আছে।

আজহার বললেন, আরেকবার এই ধরনের কথা বললে তোমাকেও ছাতাপিটা করব। মাতাপুত্র একসঙ্গে ছাতার নিচে।

লাইলি আগের জায়গাতেই আছে। আগে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন স্যুটকেসের ওপর বসে আছে। শাড়ির আঁচলে তার মুখ ঢাকা। মাঝে মাঝে শরীর কেঁপে উঠছে বলে বোঝা যাচ্ছে সে কাঁদছে। তাকে ঘিরে আছে চার-পাঁচজন কৌতূহলী মানুষ। তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে দৃশ্যটা দেখে তারা আনন্দ পাচ্ছে।

আজহার ফিরে এসে গোসল করলেন। ভাত খেলেন। বিছানায় শুয়ে পর পর দু'টা বিড়ি টেনে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। তাঁর ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলায়। টুনু তখনো ফেরে নি। তিনি মেয়েটির খোঁজ নিতে গেলেন। মেয়েটি নেই।

রেহানা শুভ্রকে নিয়ে বারান্দায় বসেছেন। ছেলের সঙ্গে কীভাবে কথা শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না। কখনো তাঁর এরকম হয় না। শুভ্র যে এরকম একটা কাণ্ড

করতে পারে তা তাঁর মাথাতেই কখনো আসে নি। শুভ্রর বাবার সঙ্গে কথা বলা যাচ্ছে না। তিনি জাপানে। চার দিন পর ফিরবেন।

রেহানা বললেন, শুভ্র, তুমি অচেনা অজানা একটা মেয়ে নিয়ে বাসায় উপস্থিত হয়েছ ?

শুভ্র বলল, মেয়েটার যে অবস্থা মা, যে-কেউ তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেত। পুরো ঘটনাটা বলি, আগে শোনো। বলব ?

রেহানা হ্যাঁ না কিছু বললেন না। শুভ্র নিজে থেকেই শুরু করল।

যূথী আজ সন্ধ্যায় তাদের বাসায় আমাকে চা খেতে বলেছে। টেলিফোনে বলে নি, চিরকুট পাঠিয়েছে। আমি তার বাসার কাছে গিয়ে দেখি একটা মেয়ে স্যুটকেসের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। প্রায় অচেতন অবস্থা। তাকে ঘিরে নানান ধরনের মানুষের জটলা।

রেহানা বললেন, ভিড় ঠেলে তুমি ভেতরে ঢুকলে এবং মহান ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে। মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলে বাসায় নিয়ে এলে ?

শুভ্র বলল, পাঁজাকোলা করে আনতে হয় নি মা। আমি যখন বললাম, আপনি কি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে যাবেন ? সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। চারপাশের লোকগুলি এমন অদ্ভুত, ওরা হাততালি দেওয়া শুরু করল।

রেহানা বললেন, ওরা হয়তো ভেবেছে বাংলা ছবির কোনো দৃশ্যের শুটিং হচ্ছে। সেরকম ভাবাই স্বাভাবিক। দর্শকদের মধ্যে আমি থাকলে আমিও হাততালি দিতাম। যাই হোক, আমি ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলেছি। মেয়েটিকে যেখান থেকে আনা হয়েছে ড্রাইভার তাকে সেখানে রেখে আসবে।

শুভ্র বলল, মা, মেয়েটি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে। বিপদ কেটে গেলে সে নিজের জায়গায় ফিরে যাবে।

রেহানা বললেন, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদে আছে। তাদের সবাইকে তুমি এখানে নিয়ে আসবে ?

শুভ্র বলল, বাংলাদেশের সব বিপদগ্রস্ত মেয়েকে আমি চিনি না মা। একে চিনি।

একেও তুমি চেনো না। হঠাৎ দেখেছ, তুলে নিয়ে এসেছ।

শুভ্র বলল, আমি তাকে নিয়ে এসেছি, এখন আমি তাকে বলব চলে যেতে ?

রেহানা বললেন, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। যা বলার আমি বলব। তুমি তোমার ঘরে চলে যাও। গান শোনো কিংবা টিভি দেখো। *ন্যাশনাল*

জিওগ্রাফিক-এর নতুন কপি আজ দুপুরেই এসেছে। সেটাও পড়তে পার।

শুভ্র বলল, মা শোনো। তুমি যদি সত্যি সত্যি মেয়েটাকে বাসা থেকে বের করে দাও, আমিও কিন্তু বের হয়ে যাব।

বের হয়ে যাবে ?

হ্যাঁ।

কোথায় যাবে ?

তা জানি না, কিন্তু বের হয়ে যাব।

রেহানা বারান্দা থেকে উঠে নিজের ঘরে ঢুকলেন। টেলিফোনে সব ঘটনা শুভ্রর বাবাকে জানালেন।

মেরাজউদ্দিন বললেন, মেয়েটাকে এই মুহূর্তে বের করে দাও। তোমার ছেলে যদি বের হয়ে যায় তাহলে যাবে। ঢাকা শহর হলো ভয়াবহ অরণ্য। অরণ্যে বাস করার যোগ্যতা তার নেই। সে ফিরে আসবে। শিক্ষাসফর শেষ করে ফিরবে। এটাই লাভ। কোনো টাকাপয়সা সে যেন সঙ্গে না নেয় এটা খেয়াল রাখবে।

রাত আটটায় রেহানা শুভ্রকে এবং মেয়েটাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

শুভ্র বলল, মা আমি যাচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার ওপর রাগ করে থেকো না। রাগ করার মতো কিছু করি নি। মেয়েটাকে দেখে খুবই কষ্ট লেগেছিল। আমরা তো বিচ্ছিন্ন কেউ না। সবাই সবার সঙ্গে যুক্ত। আমরা বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর অংশ। একই Species, হোমোসেপিয়ানস।

রেহানা বললেন, বক্তৃতা দিয়ো না। তোমার বক্তৃতা শোনার মতো মনের অবস্থা আমার না। ড্রাইভারকে বলো কোথায় তোমাদের নামিয়ে দিতে হবে, সে নামিয়ে দিয়ে চলে আসবে।

ড্রাইভার লাগবে না। মা, যাই। তোমাকে বিরাট একটা সমস্যায় ফেলেছি, সরি।

রেহানা বললেন, তোমার সঙ্গে কি মানিব্যাগ আছে ?

শুভ্র বলল, আছে।

রেহানা কঠিন গলায় বললেন, মানিব্যাগ রেখে যাও।

রাস্তায় নেমেই লাইলি বলল, এতক্ষণ খুব ভয় লাগছিল। এখন কোনো ভয় লাগছে না। বরং মজা লাগছে।

শুভ্র বলল, মজা লাগছে ?

হুঁ। খুব ক্ষিধে লেগেছে। সকালে দু'টা রুটি আর আলুভাজি খেয়েছি। সারা দিন কিছু খাই নি। ঐ দোকানে গরম গরম সিঙ্গারা ভাজছে। আসুন সিঙ্গারা খাই।

শুভ্র বলল, তোমার কাছে কি টাকা আছে ? আমার কাছে কোনো টাকা নেই।

আমার কাছে সাতশ' পঁচিশ টাকা আছে। পাশের বিরিয়ানি হাউসে যাবেন ? বিরিয়ানি খাবেন ?

তোমার খেতে ইচ্ছা করলে চলো যাই। তবে আমি কিছু খাব না।

আমার এখন এই অবস্থা পৃথিবীর সব কিছু খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে। আমার সবচেয়ে পছন্দের খাবার কী জানেন ? মাছ মাংস কিছু না। রসুনের ভর্তা। রসুন পুড়িয়ে শুকনা মরিচ দিয়ে ভর্তাটা বানানো হয়। আমার এখন রসুনভর্তা দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছা করছে।

যূথী রাত আটটায় প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে বাসায় ফিরেছে।

আজহার বাসার সামনের বারান্দায় টুল পেতে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, তোকে না অফিসের গাড়ি নামিয়ে দেবে! রিকশায় করে এসেছিস কেন ?

যূথী বলল, অফিসের গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমার নিজের চাকরিও পাংচার।

আজহার বললেন, তার মানে কী ?

এখন মানে টানে বলতে পারব না। আমার মাথায় পানি ঢালতে হবে, প্রচণ্ড জ্বর।

জ্বর হলো কেন ?

যূথী বলল, ভাইরাসঘটিত জ্বর না বাবা, চাকরি পাংচার হবার কারণে জ্বর।

সালমা মেয়ের কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন। ভীত গলায় বললেন, তোর গা তো পুড়ে যাচ্ছে রে!

যূথী বলল, পুড়ে যাওয়াই ভালো। গা পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। সেই কয়লা দিয়ে আগুন করে তোমরা চা খাবে। এবং গীত গাইবে—

পুড়ল কন্যা উড়ল ছাই
তবেই কন্যার গীত গাই।

আজহার বললেন, জ্বর মেয়ের মাথায় উঠে গেছে। বাথরুমে নিয়ে যাও, ননস্টপ মাথায় পানি ঢালতে থাকো। মেয়েকে শক্ত করে ধরো। মাথা এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে তো। আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।

মাথায় পানি ঢালতে ঢালতেই দিনে বাসায় যে নাটক হয়েছে সালমা মেয়েকে জানালেন। যুথী বলল, বড় ধরনের অন্যায় করেছ মা। কতটা সমস্যায় পড়লে একটা মেয়ে স্যুটকেস হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হয় এটা বুঝতে পারছ না ?

সালমা বললেন, টুনু কত বড় অন্যায় করেছে এটা বুঝতে পারছিস না ? সে বাপের ঘাড়ে বসে খাচ্ছে। আয় নাই, রোজগার নাই, এরমধ্যে গোপনে বিয়েও করেছে।

যুথী বলল, ভাইয়া ভুল করা বা অন্যায় করার মতো মানুষ না। খুব যারা ভালো মানুষ, যেমন আমি, আমরা হলাম গিনি সোনা। গিনি সোনা কী জানো ?

না।

গিনি সোনা হলো বাইশ ভাগ সোনা দু'ভাগ তামা। আর ভাইয়ার পুরোটাই সোনা।

সালমা বললেন, আমি কী ?

যুথী বলল, তুমি হলে গিনির উল্টা—নিগি। বাইশ ভাগ তামা আর দু'ভাগ সোনা।

তোর বাবা কী ?

বাবার মধ্যে সোনার কোনো কারবার নেই, উনার সবটাই তামা।

আজহার ডাক্তার নিয়ে এসেছেন। থার্মোমিটারে জ্বর পাওয়া গেল একশ' তিন। ডাক্তার প্যারাসিটামল এবং ঘুমের ওষুধ দিল। ভিজিট নিল না। সে এবছরই ইন্টার্নি পাশ করে তাজ ফার্মেসিতে বসা শুরু করেছে। সে ঘোষণা দিয়েছে প্রথম তিনমাস কোনো ভিজিট নেবে না। আজহারের গোপন ইচ্ছা তার সঙ্গে যুথীর বিয়ে হোক। ডাক্তারের চেহারা সুন্দর। সে তার নিজের লাল রঙের একটা গাড়ি চালিয়ে ফার্মেসিতে আসে। ডাক্তারের নামটাও আজহারের পছন্দ। ভারিক্কি নাম—আমিরুল ইসলাম চৌধুরী। পুরুষের তিন শব্দের ভালো নাম আজহারের অত্যন্ত পছন্দ।

যেসব ডাক্তার ভিজিট নেয় না তারা রোগীর বাড়িতে চা-বিসকিট খায়, কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে। এই ডাক্তার সেরকম না। প্রেসক্রিপশন লিখেই সে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যুথীকে বলল, আপনার বান্ধবী নীপা আমার খালা হন। দূরসম্পর্কের খালা।

যুথী সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাহলে আপনি অবশ্যই আমাকে খালা ডাকবেন।

আজহার বিরক্ত গলায় বললেন, এইসব কী ধরনের কথা ? ডাক্তার সাহেব, কিছু মনে করবেন না। জ্বর মাথায় উঠে যাওয়ায় যুথী আবোলতাবোল বকছে।

ডাক্তার বলল, যুথী খালার কথায় আমি কিছুই মনে করছি না।

শুভ্র লাইলিকে নিয়ে গেছে নীপাদের বাড়িতে। ঘটনা শুনে নীপা বলেছে—একটা মেয়ে বিপদে পড়েছে, সে যতদিন ইচ্ছা আমার এখানে থাকবে। দু'টা গেস্টরুম খালি পড়ে আছে, কোনো সমস্যা নেই। যুথীর সঙ্গে কথা বলে আমিই সমস্যার সমাধান করে দেব। আপনি এটা নিয়ে আর ভাববেন না। আপনি বাড়িতে চলে যান। গাড়ি দিচ্ছি। গাড়ি আপনাকে নামিয়ে দেবে।

শুভ্র বলল, গাড়ি লাগবে না। আমি হেঁটে হেঁটে যাব। আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি হবে। আমি বৃষ্টিতে ভিজব। অনেকদিন বৃষ্টিতে ভিজি না।

রাত বাজে বারোটা। আজহার এখনো স্টিলের ছাতা হাতে বারান্দায় বসে আছেন। টুনুর প্রতীক্ষা। তার দেখা নেই। সে মনে হয় ঘটনা আঁচ করতে পেরে পালিয়ে গেছে। যুথী মরার মতো ঘুমাচ্ছে। সালমা মেয়ের পাশে জেগে বসে আছেন। লাইলি মেয়েটা কোথায় আছে এই নিয়ে হঠাৎ দুশ্চিন্তা শুরু করেছেন। পুরো বিষয়টা ভুলে থাকতে চেষ্টা করছেন। পারছেন না। তাঁর মন বলছে টুনু মেয়েটাকে বিয়ে করে নি। হয়তো ভাব হয়েছে। এই মেয়ের সঙ্গে টুনুর ভাব কীভাবে হলো সেও এক রহস্য।

লাইলি দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করেছে। নীপার দেওয়া নাইটি পরেছে। পোশাকটা অশ্লীল ধরনের। লাইলির লজ্জা লাগছে, আবার ভালোও লাগছে।

নীপা বলল, এসো ছবি দেখি। বাড়িতে হোম থিয়েটার আছে। হোম থিয়েটারে ছবি দেখতে অন্যরকম মজা। বাবা যখন বাড়িতে থাকেন, তখন আমরা দু'জনে মিলে হোম থিয়েটারে ছবি দেখি।

লাইলি বলল, হোম থিয়েটার কী ?

হোম থিয়েটার হলো মিনি সিনেমাহল। Sixty two inches টিভিতে ছবি দেখা। চারদিকে সাউন্ড বক্স দেওয়া। বসার সিটগুলিও সিনেমাহলের সিটের মতো। একসঙ্গে বিশজন মিলে সিনেমা দেখার ব্যবস্থা। ভয়ের ছবি দেখবে ?

দেখব।

'সাইনিং' ছবিটা দেখেছ ? স্ট্যানলি কুব্রিকের ?

না।

চমৎকার ছবি। আমি একবার দেখেছি। আরেকবার দেখতে কোনো সমস্যা নাই।

আপনার বাবা কোথায় থাকেন ?

উনি জাহাজে জাহাজে থাকেন। আর আমার মা বাবার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছেন। আমি উনাকে ডাকতাম মজুচাচা। খুব মজা করতেন, এইজন্যে মজুচাচা। মা এখন মজুচাচার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াতে থাকেন। মায়ের একটা ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম মা আমাকে রাখতে বলেছিলেন। আমি রেখেছি। তার নাম দিয়েছি 'বন্ধু'। নামটা সুন্দর না ?

লাইলি তাকিয়ে আছে। নীপা নামের মেয়েটা কত সহজেই না নিজের কথা বলে যাচ্ছে। সে কি কোনোদিন এভাবে কথা বলতে পারবে ? বিশাল যারা বড়লোক তারা মনে হয় এভাবেই কথা বলে। আর যারা তার মামার মতো অভাবী মানুষ, তাদের কথাগুলিও হয় অভাবী।

শুভ্র সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে আছে। জায়গাটা অন্ধকার না। স্ট্রীট ল্যাম্পের আলো আছে। বসে থাকতে শুভ্রর খারাপ লাগছে না। কিছুক্ষণ আগে একপশলা বৃষ্টি হয়েছে। শুভ্রর শার্ট ভিজেছে। বাতাসে ভেজা শার্ট থেকে ঠান্ডা গায়ে লাগছে। গা কেঁপে উঠছে। তার কাছে মনে হচ্ছে সে অতিরিক্ত ঠান্ডা কোনো এসি ঘরে বসে আছে। তার বাবার অনেকগুলি অফিসের একটা এরকম ঠান্ডা। চিকেন ফেদার কোম্পানির এমডি'র অফিস।

চিকেন ফেদার নামটাও শুভ্রর দেওয়া। এবং কাগজেকলমে শুভ্র সেই অফিসের এমডি। যদিও মাত্র দু'বার সেই অফিসে গিয়েছে।

শুভ্র হঠাৎ একটু নড়েচড়ে বসল। তার বেঞ্চের এক কোনায় অল্পবয়েসী একটা মেয়ে এসে বসেছে। বাচ্চা মেয়ে। পনেরো-ষোল বছরের বেশি বয়স হবে না। মেয়েটা এত রাতে পার্কে কী করছে কে জানে! তবে মেয়েটা বেশ সহজ-স্বাভাবিক। তার সঙ্গে লাল রঙের ভ্যানিটিব্যাগ। সে ব্যাগ খুলে একটা লিপস্টিক বের করল। আয়না বের করল। এখন সে আয়োজন করে ঠোঁটে লিপস্টিক দিচ্ছে। এত রাতে মেয়েটা সাজগোজ শুরু করেছে কেন কে জানে! শুভ্র আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। এখন সে কপালে একটা লাল রঙের টিপ দিয়ে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইজান দেখেন তো টিপটা মাঝখানে পড়ছে ?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ।

মেয়েটা শুভ্রর দিকে পুরোপুরি ফিরে বলল, এই পরথম টিপ মাঝখানে পড়ছে। সবসময় আমার টিপ হয় ডাইনে বেশি যায়, নয় বাঁয়ে বেশি যায়। এর ফলাফল খুব খারাপ। ফলাফল কী জানেন ?

না।

ফলাফল সতিনের সংসার।

শুভ্র বলল, এত রাতে তুমি এখানে কী করছ ?

মেয়েটা অবাক হয়ে বলল, এত রাইতে এইখানে কী করি আপনে বুঝেন না ?

শুভ্র বলল, না। তবে তোমার উচিত বাসায় চলে যাওয়া। ঢাকা শহরে অনেক দুষ্টলোক থাকে। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিতে পারি।

মেয়েটা বলল, আমার চড়নদার লাগে না। আপনে পার্কে আসছেন কী জন্যে ? মেয়েমানুষের সন্ধানে আসেন নাই ?

শুভ্র অবাক হয়ে বলল, মেয়েমানুষের সন্ধানে কেন আসব ? আমার মা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। কাজেই আমি পার্কে বসে আছি।

মেয়েটি বলল, আমারও আপনার মতো অবস্থা। আমার বাবা-মাও আমারে বাইর কইরা দিছে। বলছে, রোজগার কইরা খা। আমি রোজগারে বাইর হইছি। এখন বুঝেছেন ?

শুভ্র বলল, না। তোমার নাম কী ?

ফুলকুমারী।

বাহ্, নামটা তো খুব সুন্দর।

ব্যবসার জন্যে এই নাম নিছি। আসল নাম মর্জিনা।

শুভ্র বলল, তোমার কিসের ব্যবসা ?

মর্জিনা বলল, কিসের ব্যবসা আপনার না জানলেও চলবে। খাওয়াদাওয়া করেছেন ?

দুপুরে খেয়েছি। রাতে কিছু খাই নি।

ক্ষিধা লাগছে ?

হ্যাঁ। মানিব্যাগ রেখে এসেছি তো। ক্ষিধে লাগলেও কিছু খেতে পারব না।

চলেন আমার সাথে।

শুভ্র বলল, কোথায় যাব ?

মর্জিনা বলল, আপনারে খানা খাওয়াব। খাবেন গরিবি খানা ?

খাব।

বাপজান রান্ধে। সে ভালো বাবুর্চি। আগে রিকশা চালাইত। ঠ্যাং কাটা পড়ায় ঘরেই থাকে। আমার জন্যে রান্ধে। তার হাতের পাক খাসির মাংস যদি খান জীবনে ভুলবেন না। আপনার নাম কী ?

শুভ্র।

দু'জন হাঁটছে। শুভ্র যাচ্ছে মেয়েটার পেছনে পেছনে। তার যে এতটা ক্ষিধে লেগেছে তা সে বুঝতে পারে নি।

মর্জিনা বলল, আপনার সাথে আমি ভাই পাতাইলাম। ঠিক আছে ?

শুভ্র বলল, অবশ্যই ঠিক আছে। এবং আমার ধারণা তুমি খুবই ভালো একটা মেয়ে। অচেনা একজনকে ভাত খাওয়ানোর জন্যে নিয়ে যাচ্ছ।

অচেনা হবেন কী জন্যে ? আপনার সাথে ভাই পাতাইলাম না ? আমার কী ধারণা জানেন, বাসায় গিয়া দেখব বাপজান খাসি পাকাইছে। খাসি আর পোলাও।

এরকম ধারণা হলো কেন ?

মর্জিনা বলল, আল্লাপাক মানুষ বুইঝা রিজিক বাটে। আপনেরে খাইতে নিতেছি—এইটাও আল্লাপাকের ইশারা।

তুমি খুব আল্লাহভক্ত মেয়ে ?

জি ভাইজান।

তোমার বাসা কোথায় ?

প্রায় চইলা আসছি। আমরা পাইপের ভিতর থাকি। তিনটা পাইপ ভাড়া নিছি। একটাত বাপজান থাকে, একটাত আমি, আরেকটা থাকে খালি। তয় বিছানা পাতা আছে। শীতলপাটি আছে, কোলবালিশ আছে, হাতপাখা আছে।

শুভ্র বলল, পাইপের বাসা ব্যাপারটা কী ?

গেলেই দেখবেন। বড় বড় পাইপের ভিতর সংসার।

মর্জিনার বাবা ইয়াকুব সত্যি সত্যি খাসির মাংস এবং পোলাও রান্না করেছে। মর্জিনা শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইজান, আমার কথা সত্য হইছে ?

শুভ্র বলল, হয়েছে।

মর্জিনা বলল, আরাম কইরা খান। খায়া পাইপের ভিতর ঘুম দেন। ঝুম বৃষ্টি নামব। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। দেহেন আসমানের অবস্থা।

খেতে খেতে শুভ্র ইয়াকুবকে বলল, আপনার রান্না অসাধারণ। খাসির মাংসের এই স্বাদ অনেকদিন আমার মুখে লেগে থাকবে। আপনি একটা রেস্টুরেন্ট দেন না কেন ?

ইয়াকুব বলল, বাবা, টাকা থাকলে রেস্টুরেন্ট দিতাম। মূল জিনিসই নাই। মূল ছাড়া বিদ্যা কাজে লাগে না। তবে বাবা, একসময় আমার টাকা ছিল। পদ্মার ধারে টিনের ঘর ছিল। দুইটা গাভি ছিল। নৌকা ছিল। ধানী জমি ছিল কুড়ি বিঘা। বসতবাড়িতে আমগাছ ছিল এগারোটা, কাঁঠাল গাছ দশটা, গাব গাছ ছিল তিনটা। জাম্বুরা গাছ নয়টা...

মর্জিনা বলল, বাপজান, গাছের হিসাব বন্ধ করো।

ইয়াকুব বলল, গাছের হিসাব দিতে ভালো লাগে। মনে হয় এখনো সব আছে।

শুভ্র বলল, আপনার ঘরবাড়ি কোথায় গেছে?

পদ্মায় ভাইঙা নিয়া গেছে। তবে এখন খবর পাইছি বিরাট চর জাগছে। যাদের ঘর ভাঙছে সরকার তারারে চরে জমি দিতেছে। ইচ্ছা করে একবার চেষ্টা নেই। আগের জমির দলিল সবই আমার কাছে আছে।

শুভ্র বলল, চেষ্টা নিতে সমস্যা কী?

মর্জিনা বলল, একটাই সমস্যা। আমরা গরিব। চরের দখল কোনোদিন গরিবে পায় না। এই আলোচনা বাদ। ভাইজান, পান খাইবেন?

শুভ্র বলল, পান আমি খাই না, কিন্তু আজ খাব।

হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। পান মুখে দিয়ে শুভ্র পাইপের বিছানায় ঘুমুতে গেল। মর্জিনা মাথার কাছে কুপি এবং ম্যাচ রেখে বলল, ভাই পাতাইলে ভাইরে কিছু দিতে হয়। ধরেন ভাইজান, বিশটা টাকা রাখেন।

শুভ্র বলল, থ্যাংক য়্যু।

সে আগ্রহ করে টাকাটা নিল।

পাইপের বিছানায় রাতে তার খুব ভালো ঘুম হলো।



সকাল এগারোটা। চিকেন ফেদার-এর হেড অফিসে হঠাৎ করেই তুমুল ব্যস্ততা। এমডি সাহেব এসেছেন। তাঁর ঘরের তালা খুলে দেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রিসিটি নেই বলে এসি চালু করা যাচ্ছে না। জরুরি ভিত্তিতে জেনারেটার দিয়ে এমডি সাহেবের এসি চালু করা হয়েছে।

চিকেন ফেদারের জেনারেল ম্যানেজার আহসান টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এমডি সাহেবের অনুমতি ছাড়াই তিনি বসবেন কি বসবেন না এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তাঁকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে।

শুভ্র বলল, বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

আহসান বসলেন।

শুভ্র বলল, মনে হয় আজ সন্ধ্যায় বাবার জাপান থেকে ফেরার কথা।

আহসান বিস্মিত হয়ে বললেন, উনি তো গতকাল ফিরেছেন! স্যার আপনি জানেন না?

শুভ্র বলল, আমি বাড়িতে ছিলাম না। আমার এক বোনের সঙ্গে ছিলাম। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ নেই। যাই হোক, আমার কিছু টাকা দরকার। কীভাবে পাব?

টাকার পরিমাণ কত স্যার?

দু'লাখ হলেই চলবে।

আহসান বললেন, একটা স্লিপ দিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারেন। কিংবা চেক কাটতে পারেন। আপনার ড্রয়ারে চেক বই আছে। চেক কাটলে একটু সময় লাগবে।

শুভ্র স্লিপ লিখে টাকা নিল।

আহসান বললেন, চা খাবেন স্যার?

শুভ্র বলল, চা খাব। চা দিতে বলুন। আমি দুটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। একটা যাবে আমার মা'র কাছে। আরেকটা যাবে একটা মেয়ের কাছে। তার ঠিকানা

জানি না, তবে বাসা চিনি। আমার গাড়ির ড্রাইভার তার বাসা চেনে। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

আহসান বলল, অবশ্যই নিয়ে যাব। স্যার, আপনার বোনের বাসা কোথায় ?

ও বস্তিতে থাকে। ঠিক বস্তিও বলা যাবে না। পাইপের ভেতর সংসার। জায়গাটা কাঁটাবনের আশেপাশে। রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের গুদামঘরের বাউন্ডারির ভেতর।

আহসান বলল, স্যার, আমি খুবই কনফিউজড বোধ করছি।

শুভ্র বলল, কনফিউজড হবার কিছু নেই। অনেকেই এ ধরনের বাড়িতে থাকে। ফুটপাতে থাকার চেয়ে ভালো।

স্যার, আপনি কি বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলবেন ? আমি লাইন করে দেব ?

শুভ্র বলল, বাবার সঙ্গে এখন কথা বলব না। চা খেয়ে বিদায় হব।

কোথায় যাবেন ?

কিছু বইপত্র কিনব।

স্যার, বইয়ের লিস্ট দিয়ে দিন, আমি কিনে নিয়ে আসছি।

আমি নিজে দেখেশুনে কিনব।

আহসান বিব্রত গলায় বলল, স্যার, আপনার বোনের নামটা কি জানতে পারি ?

শুভ্র বলল, অবশ্যই পারেন। ওর আসল নাম মর্জিনা। তবে ওকে সবাই ফুলকুমারী নামে চেনে। ওর বাবার নাম ইসহাক। আগে রিকশা চালাতেন। ট্রাকের ধাক্কায় পা কাটা পড়েছে। এখন পাইপেই বেশির ভাগ সময় থাকেন। উনার রান্নার হাত খুবই ভালো।

আহসান হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে এক্ষুনি তার বড় সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। সেটাও করা সম্ভব হচ্ছে না। এমডি সাহেব সামনে বসে আছেন।

শুভ্র চা খেয়ে টাকা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আহসান বলল, স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে আসব ?

শুভ্র বলল, না।

আপনি তো গাড়ি আনেন নি। অফিসের গাড়ি দিয়ে দেই ?

শুভ্র বলল, না। রিকশায় করে ঘুরতে আমার চমৎকার লাগে।

শুভ্রর লেখা চিঠিটা রেহানা এই নিয়ে চারবার পড়লেন। পঞ্চমবার পড়তে যাচ্ছেন তখন মেরাজউদ্দিন বললেন, দেখি কী লিখেছে। রেহানা স্বামীর হাতে চিঠি দিয়ে চোখ মুছলেন। শুভ্র চলে যাবার পর থেকে একটু পর পর তাঁর চোখে পানি আসছে।

শুভ্র লিখেছে—

মা,

কাল রাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্নটা বেশ মজার। আমি চশমা হারিয়ে ফেলেছি। আর তুমি বলছ, কান্না বন্ধ করো। একটা স্পেয়ার চশমা সবসময় তোমার ড্রয়ারে থাকে। তুমি কি ড্রয়ার খুলে দেখেছ?

আমি ড্রয়ার খুললাম। দেখি ড্রয়ারে শুধু আমার মানিব্যাগটা আছে। আমি মানিব্যাগ খুলে দেখি মানিব্যাগের ভেতর আমার চশমা।

স্বপ্নে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার হয় মা। মানিব্যাগের ভেতর টাকার বদলে চশমা পাওয়া যায়। তবে স্বপ্ন যত অদ্ভুতই হোক তার ব্যাখ্যা থাকে। চশমা ছাড়া আমি অচল, কাজেই যে-কোনো দুঃস্বপ্নে আমি চশমা দেখব এটাই স্বাভাবিক।

টাকাপয়সার হঠাৎ অভাবে ঝামেলায় পড়েছিলাম বলে মানিব্যাগ স্বপ্নে দেখেছি।

মা শোনো। আমি চিকেন ফেদার অফিসের ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা স্লিপ কেটে নিয়েছি। বাবা ঘটনাটা জানলে হয়তো মনে কষ্ট পাবেন। বাবা আমার আইডল। আমি কোনো অবস্থাতেই বাবাকে কষ্ট দিতে চাই না। মা, তুমি তোমার কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা অফিসে জমা দিয়ে দিয়ো।

আমি ভালো আছি। বেশ ভালো আছি। তুমি এবং বাবা তোমাদের দু'জনের ধারণা আমি তোমাদের প্রটেকশন ছাড়া অচল। ধারণা মিথ্যা।

মা শোনো। ঐদিন একটা অসহায় মেয়েকে তুমি সাহায্য করো নি। আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই আমি জেনে এসেছি, তুমি এবং বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। এর ব্যতিক্রম যখনই দেখি তখন অস্থির লাগে।

মা, তুমি ভালো থেকো এবং আমার ওপর রাগ করো না। কেউ আমার ওপর রাগ করে থাকলে আমার কেমন জানি লাগে। নিজেকে তখন ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মনে হয়।

ইতি

তোমার শুভ্র

মেরাজউদ্দিন বললেন, রেহানা, তুমি upset হয়ো না। সবকিছু কনট্রোলের ভেতর চলে আসবে। আমাদের হিসেবে সামান্য ভুল হয়েছে। ভুল হবেই। ভুল থেকে আমরা শিখব। আহসান কি এসেছে ?

হ্যাঁ, ড্রয়িংরুমে বসে আছে।

ওকে ডাকো। ওর সামনে এমন কিছু করবে না যাতে অস্থিরতা প্রকাশ পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি অস্থির হলে সেই অস্থিরতা সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

রেহানা বললেন, আমরা কি যুদ্ধে নেমেছি ?

প্রচুর বিত্ত মানেই যুদ্ধ। বিত্ত সামলানোর যুদ্ধ। বিত্ত বাড়ানোর যুদ্ধ।

মেরাজউদ্দিন এবং রেহানা খাবার টেবিলে বসে ছিলেন। আহসানকে ভীত এবং সংকুচিত ভঙ্গিতে তাদের সঙ্গে বসতে হলো। মেরাজউদ্দিন বললেন, আহসান, কেমন আছ ?

আহসান বলল, স্যার ভালো আছি।

আজ আমার বাড়িতে কেক কাটার মতো একটা আনন্দময় ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়ে কি কিছু জানো ?

জানি না স্যার।

শুভ্রর M.Sc. পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে। ও রেকর্ড নাম্বার পেয়ে প্রথমশ্রেণীতে প্রথম হয়েছে। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। সে যে KNS তা জানো ?

জানি না স্যার। KNS কী ?

কালিনারায়ণ স্কলার। যাই হোক, চিকেন ফেদার অফিসে এই উপলক্ষে তোমরা একটা কেক কাটবে।

অবশ্যই স্যার।

মেরাজউদ্দিন আহসানের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, এডোলোসেন্স পিরিয়ড ১৯ বছরেই শেষ হবার কথা। অনেকের হয় না। শুভ্রর হয় নি। হয় নি বলেই সে পাইপের ভেতর বাস করার অদ্ভুত কাণ্ড করছে। তার বিষয় হচ্ছে Physics, পাইপ না।

অবশ্যই স্যার।

সে কোথায় থাকে কী ব্যাপার খোঁজ নিয়েছ ?

নিয়েছি স্যার। তারা কেউ এখন সেখানে নেই। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারছে না।

রেহানা বললেন, যে মেয়েটিকে সে বোন বলছে, মর্জিনা না কী যেন নাম, ওই মেয়েটি কে ?

আহসান বিব্রত গলায় বলল, বলতে লজ্জা পাচ্ছি ম্যাডাম। মেয়েটা একটা প্রস্টিটিউট।

কী বললে ?

ম্যাডাম, ভাসমান পতিতা।

রেহানা এবং মেরাজউদ্দিন দু'জনের কেউ বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। দু'জন অবাক হয়ে আহসানের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আহসান বলল, স্যার, আমাকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিন, আমি খোঁজ বের করে ফেলব। সব জায়গায় খবর চলে গেছে। থানাতে জানিয়েছি। থানাওয়ালারা কিছু করতে পারবে না। আমি দালাল লাগিয়েছি।

মেরাজউদ্দিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে রেহানার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ছেলে পুরো বিষয়টাকে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং করে তুলেছে। তাই না ?

রেহানা কিছু বললেন না। আহসান বলল, ম্যাডাম, আমার ওপর আর কোনো নির্দেশ কি আছে ?

রেহানা বললেন, তুমি বলেছ শুভ্র আরেকটি মেয়েকে চিঠি লিখে গেছে। ওই চিঠি কি পৌঁছানো হয়েছে ?

না। চিঠিটা আমার সঙ্গেই আছে। আপনি কি পড়ে দেখবেন ?

রেহানা বললেন, দেখব।

মেরাজউদ্দিন বললেন, অবশ্যই তুমি সেই চিঠি পড়বে না। প্রাইভেসি আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে হবে।

রেহানা বললেন, একটা সময় আসে যখন প্রয়োজনেই প্রাইভেসি ভাঙতে হয়। এখন সেই সময়। চিঠিটা আমি অবশ্যই পড়ব।

আহসান চিঠি এগিয়ে দিল।

> যুথী,
>
> আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন ? সন্ধ্যাবেলা বাসায় চা খাবার দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমি আসি নি। কেন আসতে পারি নি সেই ব্যাখ্যাও করি নি।
>
> এখন নিশ্চয়ই ব্যাখ্যাটা আপনি জানেন। আপনার বান্ধবী নীপা আপনাকে বলেছে। লাইলি কি ফিরেছে আপনাদের বাসায় ?
>
> No man is an island. আমরা কেউ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ না। আমরা খুবই ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। যে

কারণেই লাইলি আপনাদের কাছে ফিরেছে কি না জানার জন্যে আমি আগ্রহী।

আপনি কি গান শেখা শুরু করেছেন ? আমি নিশ্চিত, একদিন গায়িকা হিসেবে আপনার খুব নাম হবে। পত্রিকায় ইন্টারভিউ, অটোগ্রাফ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন। সেইসব ইন্টারভিউতে আমার নাম চলে আসবে। আপনি বলবেন, আমার গানের সিঁড়ির প্রথম ধাপ শুভ্র নামের একজন প্রতিবন্ধী মানুষ করে দিয়েছিলেন। আমাদের সবারই প্রথম কয়েকটি সিঁড়ি অন্যদের কেটে দিতে হয়। বাবা-মা-বন্ধুরা কাটেন। আবার নিতান্ত অপরিচিতজনও কাটেন। যেমন, আপনার একটি সিঁড়ি হলেও আমি কেটেছি।

আমার খুব ইচ্ছা অসংখ্য মানুষের জন্যে আমি সিঁড়ি কাটব। তখন আপনি আর আমাকে গাধামানব বলবেন না। বলবেন সিঁড়ি-মানব।

ইতি

শুভ্র।

রেহান চিঠিটা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, তোমার ছেলে রাজমিস্ত্রি হয়েছে। সিঁড়ি বানাবার কারিগর। চিঠিটা পড়ো।

মেরাজউদ্দিন চিঠি পড়লেন। আহসানকে বললেন, মেয়েটিকে তুমি আমার এখানে নিয়ে আসবে। মেয়েটির সাহায্য আমাদের প্রয়োজন। শুভ্র আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করলেও এই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

স্যার, আমি এখনই যাচ্ছি।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তোমাকে এখনই যেতে হবে না। তুমি আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় চেয়েছ। আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হোক। তারপর যাবে। আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর শুভ্রর সন্ধান পাওয়া মেয়েটির আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারছ ?

পারছি। স্যার, আমি কি উঠব ?

হ্যাঁ।

আহসান চলে যাবার পর মেরাজউদ্দিন বললেন, রেহানা! চা খাব। চা দিতে বলো।

মেরাজউদ্দিনের অসময়ে চা খাওয়ার অর্থ তিনি কোনো আলোচনায় যাবেন। চা তাঁর পছন্দের পানীয় না। আলোচনার অনুষঙ্গ।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মেরাজউদ্দিন বললেন, একটা বয়সে প্রতিটি যুবক কিছুদিনের জন্যে কার্ল মার্কস্ হয়ে যায়। নিপীড়িত অবহেলিত মানুষের জন্যে কিছু করতে হবে—এই ভূত মাথায় ভর করে। এটা হলো এক ধরনের ভাইরাস সংক্রমণ। ভাইরাসের কোনো ওষুধ নেই। এই অসুখেরও ওষুধ নেই। কিছুদিন পর আপনাআপনি ভাইরাস মারা যায়। রোগী সেরে ওঠে। তোমার ছেলের ব্যাপারেও একই ঘটনা ঘটবে।

রেহানা বললেন, আমার ছেলে অন্য দশটা ছেলের মতো না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, সব মায়ের ধারণা তার ছেলে অন্য দশজনের মতো না।

রেহানা বললেন, রবীন্দ্রনাথের মায়েরও নিশ্চয়ই এরকম ধারণা ছিল। রবীন্দ্রনাথ কি আলাদা না?

মেরাজউদ্দিন বললেন, তোমার ছেলে রবীন্দ্রনাথ না। আইনস্টাইনও না। সে পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়া একজন গর্ধব।

গর্ধব?

অবশ্যই। আমি চাই তার শিক্ষা সফর হোক। শিক্ষা সফর শেষে এই বাড়িতে সে ঢুকবে। তবে হেঁটে ঢুকবে না। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকবে।

এত রেগে গেছ কেন?

তোমার ছেলে একজন প্রস্টিটিউটের সঙ্গে বোন পাতাবে। পাইপে বাস করবে। আমি রাগ করব না? অফিস থেকে সে দু'লক্ষ টাকা নিয়েছে। এক অর্থে চুরি করেছে। সে শুধু যে গর্ধব তা-না, চোর গর্ধব।

রেহানা বললেন, ওই টাকা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মেরাজউদ্দিন বললেন, গুড। পাঠিয়ে দাও।

এখন যুথীদের বাড়ির পরিস্থিতি বর্ণনা করা যেতে পারে।

টুনুর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। সে কোনোরকম যোগাযোগ করে নি।

লাইলি এখনো নীপাদের বাড়িতে আছে। যুথীদের কারও সঙ্গে তার এখনো দেখা হয় নি বা টেলিফোনে কথা হয় নি। নীপা কয়েকবার টেলিফোন করেছে। যুথী টেলিফোন ধরে নি। টেলিফোন ধরার মতো অবস্থা তার ছিল না। জ্বরে এই ক'দিন অচেতনের মতো ছিল।

আজ তার জ্বর নেই। সে শুকনা মুখে বসার ঘরে বসে আছে। তার সামনে গানের টিচার অশোক মিত্র বসে আছেন। তিনি তবলা নিয়ে এসেছেন। ঝালর দেওয়া ওয়ার দিয়ে তবলা এবং বাঁয়া দু'টাই ঢাকা। এই দুই বস্তু তাঁর অতি আদরের তা বোঝা যাচ্ছে।

অশোক মিত্র বললেন, আসুন শুরু করে দেই। হারমোনিয়াম কোথায় ? কী হারমোনিয়াম, টিউনিং ঠিক আছে কি না দেখা দরকার।

যুথী বলল, কিছু মনে করবেন না, আমি গান শিখব না।

অশোক মিত্র বললেন, এটা কেমন কথা! আমার হিসাবের টিউশনি। আপনার জন্যে যে জায়গা রেখেছিলাম সেটা এখন কী করব ? নতুন ছাত্র কই পাব ?

যুথী বলল, আমার বিরাট বড় একটা আর্থিক সমস্যা হয়েছে। মাসে মাসে এক হাজার টাকা দেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব না।

যখন সম্ভব হবে তখন দিবেন। আপাতত আসা-যাওয়ার রিকশা ভাড়া আর যৎসামান্য নাস্তা দিলেই হবে। বাসে করেই আসা-যাওয়া করতাম। তবলা নিয়ে তো বাসে ওঠা সম্ভব না। হারমোনিয়াম নিয়ে পাশে বসেন।

যুথী বলল, আমার গলায় কোনো সুর নেই।

অশোক মিত্র বললেন, সুর আমি দিব। তিন বছর আমার সঙ্গে শিখবেন। তারপর বিটিভিতে অডিশন। এখন বিটিভিতে গানের অডিশন যে নেয় সে আমার ছাত্র। নাম রকিব। অডিশনে যেন পাশ করিয়ে দেয় সেই দায়িত্ব আমার। ইদানীং শুনেছি সে অডিশনে পাশ করানোর জন্যে পার ক্যান্ডিডেট দশ হাজার করে টাকা নেয়। দেনদরবার করে সেটা হাফ করে দেব। আমি তার গুরু। গুরুর কথা সে ফেলতে পারবে না। কী হারমোনিয়াম কেনা হয়েছে একটু দেখি। খাতা লাগবে। খাতায় সরগম লিখে দিব। প্রথম দিন সারেগা এই তিনটা স্বর। এর বেশি না। আমার শিক্ষাপদ্ধতি ভিন্ন।

যুথী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হারমোনিয়াম আনতে গেল।

ছুটির দিন। আজহার ঘুমাচ্ছিলেন। হারমোনিয়ামের শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি বিছানায় উঠে বসে রাগী গলায় ডাকলেন, সালমা! সালমা!

সালমা ভীত মুখে উপস্থিত হলেন। আজহার বললেন, পেঁ পুঁ শব্দ কিসের ?

সালমা বললেন, যুথীর গানের টিচার এসেছে।

আজহার বললেন, যুথীর গানের টিচার এসেছে মানে কী ?

সে গান শিখবে বলে ঠিক করেছে।

আজহার বিস্মিত গলায় বললেন, সংসারের এই হাল। তার বড়ভাই নিখোঁজ। হারামজাদা গোপনে বিয়ে করেছে। সেই বৌ পড়ে আছে আরেক বাড়িতে। আর সে গান ধরেছে ? নাচটা বাকি কেন ? নাচ শিখুক। তারপর কোনো যাত্রাদলে ভর্তি হয়ে যাক। মেয়েকে ডাকো।

সালমা বললেন, এখন কিছু বোলো না। টিচার এসেছে, তার সামনে হৈচৈ করার দরকার নেই। টিচার চলে যাক, তারপর যা বলার বলবে।

আজহার বললেন, তোমাকে ডাকতে বলেছি তুমি ডাকো। সাপের বিষ প্রথম দিনেই ঝাড়তে হয়। বিষ ফেলে রাখা যায় না। তোমার মেয়ে সর্পিনী হয়েছে। আজ সে দেখবে আমি কত বড় ওঝা।

সালমা যূথীকে ডাকতে গেলেন। এই ফাঁকে তিনি তিনবার দরুদে শেফা পড়লেন। এই দরুদ শরীফ পরিস্থিতি শান্ত করার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। তিনি এই দরুদ পড়ে অনেকবার ফল পেয়েছেন।

আজহার বিড়ি ধরাতে ধরাতে মেয়ের দিকে না তাকিয়ে বললেন, তোর মা'র কাছে শুনলাম তুই গান ধরেছিস ?

যূথী বলল, তুমি যেমন বিড়ি ধরেছ আমি গান ধরেছি।

নাচটা কখন ধরবি ?

যূথী বলল, নাচের কথা এখনো মাথায় আসে নি। যদি আসে নাচ ধরব।

আজহার বললেন, নাচ-গান শেখার পর কী করবি ? বাইজিবাড়ি খুলবি ?

যূথী বলল, বাবা, এ ধরনের নোংরা কথা আমার সঙ্গে আর যদি কখনো বলো আমি একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করব।

কী করবি ? তোর ভাইয়ের মতো বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাবি ? তুই কি ভেবেছিস তোর কীর্তিকলাপ আমি জানি না ? করিম আঙ্কেল নামের এক লোক মদ খাওয়ার জন্যে তোকে সাধাসাধি করে না ? তোর বান্ধবীরা সুইমিংপুলে নেংটা হয়ে নামে নাই ? আমার ধারণা তুইও নেমেছিস। লজ্জার লিখিস নাই।

আমার ডায়েরি তাহলে তোমার কাছে ?

হ্যাঁ, আমার কাছে। কী করবি ? থানায় আমার নামে কেইস করবি ? যা কেইস কর। কিছুদিন জেলে বাস করি। এই সংসারে বাস করার চেয়ে জেলে বাস করা ভালো।

যূথী বাবার সামনে থেকে শান্ত ভঙ্গিতে বের হয়ে তার গানের টিচারের কাছে গেল। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আগে পরীক্ষা করে দেখুন আমার গান হবে কি না। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। যদি হয় তাহলেই শিখব।

অশোক বাবু বললেন, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুন, সা।

যূথী বলল, সা।

এখন বলুন, রেগা।

রেগা।

রেগাসা।

রেগাসা।

রেগা সাসারে।

রেগা সাসারে।

অশোক মিত্র বললেন, আপনার গান হবে এবং খুবই ভালো হবে। আপনার গলার স্বরে অস্বাভাবিক মিষ্টতা আছে। এই ধরনের কণ্ঠস্বরের একটা নাম আছে— কিন্নর স্বর। কিন্নর হলো দেবগায়ক। এখন আমার জন্যে একটু টিফিনের ব্যবস্থা করেন। ঘরে যদি ডিম থাকে একটা ডিম হাফবয়েল করে দিতে বলেন। আলাদা করে লবণ আর গোলমরিচ গুঁড়া। আর চিনি ছাড়া এককাপ দুধ-চা। আমার ডায়াবেটিস। ট্যাবলেট সঙ্গে আছে।

সন্ধ্যাবেলা যুথীর বড় চাচা হাজি মোবারক এক টিন মুড়ি, এক টিন চিড়া এবং কলার কাঁদি নিয়ে উপস্থিত। তাঁর কিছুদিন ধরে পেটে ব্যথা। কোনো চিকিৎসাতেই আরাম হচ্ছে না। তিনি ঢাকায় বড় ডাক্তার দেখাতে এসেছেন।

বাড়িতে পা দিয়েই তিনি সবাইকে কলা খাওয়ানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজহার বড়ভাইকে খুশি করার জন্যে পর পর চারটা কলা খেয়ে ফেললেন।

মোবারক বললেন, এই কলার নাম স্বর্ণচাপা কলা। এখনো ঠিকমতো পাকে নাই। পাকলে মধুর চেয়ে মিষ্ট হবে। তুই আরেকটা কলা খা।

আজহার পঞ্চম কলা খেলেন।

মোবারক বললেন, আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যা। পেটে আলসার না কী যেন রোগ আছে, ওইটা হয়েছে। মফস্বলের চিকিৎসায় কিছু উনিশ-বিশ হয় না। ঢাকার চিকিৎসা লাগবে।

আজহার বড়ভাইকে নিয়ে সেদিনই ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার নানান টেস্ট করতে দিয়ে বললেন, আমার সন্দেহ স্টোমাক ক্যানসার। আমি সাজেস্ট করব হাসপাতালে বা ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে যেতে। হাসপাতালে থেকে টেস্ট করাতেও সুবিধা।

তৃতীয় দিনে ডাক্তার নিশ্চিতভাবে বললেন, ক্যানসার। তিনি আজহারকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে বললেন, ক্যানসারের শেষ পর্যায়। চিকিৎসায় ব্যথা কমবে, এর বেশি কিছু হবে না। ক্যানসার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। আপনারা এতদিন কোথায় ছিলেন?

আজহার বললেন, সুস্থ সবল মানুষ। হাঁটাচলা করছে। একা চলে এসেছে ঢাকায়। ঠিকমতো দেখেছেন?

ঠিকমতোই দেখেছি। অন্য কাউকে দেখাতে চাইলে দেখান।

আজহার ভাইকে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। মোবারক বললেন, গাধা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিস। চেহারা দেখেই বুঝা যায় কিছু জানে না।

আজহার বললেন, কাল আরো বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। আপনি ঠিকই বলছেন। গাধা ডাক্তার।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ডাক্তার একই কথা বললেন।

মোবারক বললেন, ঢাকার সব ডাক্তারই তো মনে হয় গাধা। হয়েছে আলসার, বলে ক্যানসার। সব ডাক্তার আছে দু'টা টাকা বেশি কামানোর ধান্দায়। ক্যানসারের ভয় দেখিয়ে দু'টা টাকা বেশি কামানো। আমি বাড়িতে চলে যাব। চিকিৎসা নাই খামাখা টাকা নষ্ট।

তিনি ঘুমান টুনুর ঘরে। সারা রাত ব্যথায় চিৎকার করেন। বাসার অন্য কেউ তাঁর গোঙানির শব্দে ঘুমাতে পারে না। হঠাৎ তাঁর ব্যথা পুরোপুরি কমে যায়। তিনি উঠে বসে আনন্দিত গলায় ডাকেন, আজহার কই! আজহার!

আজহার ছুটে আসেন। মোবারক বললেন, ব্যথা একেবারেই নাই। আয় দুই চারটা সাংসারিক আলাপ করি। টুনুর কোনো সন্ধান কি পাওয়া গেল?

না।

আগে কখনো বাড়িঘর ছেড়ে গেছে?

আগেও গিয়েছে। পরীক্ষায় ফেল করলেই কিছুদিনের জন্যে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যায়। দ্বিতীয়বার ইন্টারমিডিয়েটে ফেল করার পর তিন মাস বাসায় আসে নাই।

এইবার ঘরে ফিরা মাত্র বিয়ে দিয়ে দিবি। আমার হাতে পাত্রী আছে। মেয়ে শ্যামলা, তবে মুখের কাটিং ভালো। যুথী আম্মার চেয়েও ভালো। মেয়ের বাবার টাকাপয়সা আছে। মেয়ের জন্যে খরচপাতি করবে। আমি আভাস দিয়ে রেখেছি। তুই রাজি থাকলে ফাইনাল কথা বলব।

আজহার বিরসমুখে বললেন, আপনাকে কিছু বলতে হবে না। লোকমুখে শুনতে পাই হারামজাদা গোপনে বিয়ে করেছে।

মোবারক চিন্তিত গলায় বললেন, কী সর্বনাশ! কই আমি তো কিছু জানি না।

আপনাকে ইচ্ছা করে কিছু জানাই নাই। জানানোর মতো বিষয় তো না।

টুনু কি ওই বউয়ের সঙ্গে আছে?

জানি না।

মেয়েটাকে যে বিয়ে করেছে তার নাম কী ?

জানি না।

লাইলিকে দেখে যে-কেউ বলবে নীপাদের বাড়িতেই সে বড় হয়েছে। এই বাড়ির বাইরে তার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রথম দু'দিন সে গেস্টরুমে ছিল, এখন সে নীপার সঙ্গে ঘুমায়।

নীপার বাবা আবদুর রহমান এর মধ্যে তিন দিনের জন্যে এসেছিলেন। নীপা লাইলিকে বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

বাবা, অনেকের পালক ছেলে পালক মেয়ে থাকে। এ আমার পালক বান্ধবী। এর নাম লাইলি। তবে আমি সংক্ষেপে ডাকি 'লা'।

আবদুর রহমান হাসিমুখে বললেন, হ্যালো লা।

লাইলি কী বলবে বুঝতে পারল না। আবদুর রহমান বললেন, বিশাল বাড়িতে আমার মেয়ে একা থাকে। তার যে একটা সঙ্গী হয়েছে এতেই আমি খুশি। শুধু খুশি না, very happy.

আবদুর রহমান তিন দিনের জন্যে এসেছিলেন, এই তিন দনের দু'দিন ঘুমিয়ে কাটালেন। তৃতীয় দিনে ঘণ্টা চারেকের জন্যে বাইরে গেলেন এবং খুবই অল্পবয়স্ক এক তরুণীকে নিয়ে ফিরলেন। সুইমিংপুলে পানি দেওয়া হলো। দুপুরবেলা তরুণীকে নিয়ে তিনি সুইমিংপুলে নামলেন। নীপা এবং লাইলিকে খবর পাঠালেন তারাও যেন আসে।

লাইলি নীপাকে বলল, ওই মেয়েটা কে ?

নীপা বলল, জানি না। প্রথম দেখছি। বাবার কোনো বান্ধবী হবে। আগে কখনো দেখি নি। চলো সুইমিং করি।

লাইলি বলল, আমি না।

নীপা বলল, আমি না আবার কী! চলো তো। সুইমিং করার সময় বাবা প্রচুর বিয়ার খায়। মজার মজার কথা বলে। শুনলে মজা পাবে।

লাইলি বলল, না।

নীপা বলল, দু'বার না বলে ফেলেছ। তৃতীয়বার বললে কিন্তু চড় খাবে।

লাইলি পানিতে নেমেছে। তার গায়ে নীপার সুইমিং কস্টিউম। লজ্জায় সে নিজের দিকে তাকাতে পারছে না। অন্যদের দিকেও তাকাতে পারছে না। আবদুর রহমান

বললেন, এই যে দুই বান্ধবী! পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এই অতি রূপবতী মেয়েটির নাম অনিকা। সে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করে। অনিকা, শুরু করো।

অনিকা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি শুরু করল। তবে ইংরেজি কিছু না, বাংলা। সে এত সুন্দর করে আবৃত্তি করল যে শুনে লাইলির চোখে পানি এসে গেল। এ বাড়িতে ওঠার পর সে টুনুর কথা ভুলেই গিয়েছিল। টুনুর কথা মনে পড়ল।

শুধু তোমার বাণী নয় গো
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাব যে
খুঁজে না পাই দিশা।
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়
সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।
হৃদয় আমার চায় যে দিতে
কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার
যা-কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো,
দাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে, ভরব তারে
রাখব তারে সাথে
একলা পথে চলা আমার
করব রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

আজহার তাঁর বড়ভাইকে ক্যানসার হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। নানান ধরনের চিকিৎসা একসঙ্গে শুরু হয়েছে। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ (গ্যারান্টি দিয়ে ক্যানসার এবং হাঁপানীর চিকিৎসা করেন। তিনবার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) এস নন্দি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছেন। চব্বিশ ঘন্টায় সাগুদানা সাইজের একটা বড়ি খেতে হয়।

ভেষজ চিকিৎসা চলছে। ওলট কম্বল গাছের পাতা ভেজানো পানি সকালে একগ্লাস করে খাচ্ছেন।

স্বপ্নযোগে পাওয়া বিকট দুর্গন্ধের সিরাপ খালিপেটে এক চামচ করে খাওয়া হচ্ছে। যে মহিলা এই সিরাপ দিয়েছেন তিনি বলেছেন, এই ওষুধের কাছে ক্যানসার সর্দিজ্বরের মতো মামুলি। সমস্যা একটাই, এই ওষুধ খেলে অন্য ওষুধ বন্ধ রাখতে হবে। ওষুধ যদি কাজ না করে এই একটা কারণেই করবে না।

রোগী এখন কোনো খাবারই খেতে পারছেন না। তবে তাঁর নানাবিধ অদ্ভুত খাবার খেতে ইচ্ছা করছে। যেমন করলা দিয়ে টেংরা মাছের ঝোল। খইলসা মাছের টক সালুন। ওলকচুর ভর্তা। চিতল মাছের ডিমের ভুনা।

আজহার ভাইয়ের খাবারের জন্যে প্রচুর ছোটাছুটি করছেন। রাতে তিনি হাসপাতালেই থাকেন। মাদুর এবং মশার কয়েল সঙ্গে নিয়ে যান। বারান্দায় মশার কয়েল জ্বালিয়ে মাদুর পেতে শুয়ে থাকেন। রাতে তাঁর ঘুম একেবারেই হয় না। তিনি কয়েকবার ভাইয়ের বিছানার কাছে যান। হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকেন। চোখের সামনে মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয়ে তার শরীরে মাঝে মাঝে কাঁপুনি আসে। ভাইয়ের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও মাঝে মাঝে হয়। সবই সাংসারিক কথা।

আজহার, আমার দুই পুলার কারবার দেখছস ? বাপ মৃত্যুশয্যায়, আর দুইভাই আছে সংসার নিয়া। এই সময় পুলাপানের মুখ দেখলেও শরীরে কিছু বল হয়। হয় না ?

আজহার চুপ করে থাকেন। খবর দেওয়ার পরেও দুই ছেলের কেউ আসে নি। এই ঘটনা সত্য।

এরা কী জন্যে আসে না জানস ? আসলেই চিকিৎসা খরচ দিতে হবে। এই ভয়ে আসে না। এমনিতে দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনো মিল নাই। একটা দিকে মিল। বাপের জন্যে কিছু করব না। তোর ভাগ্য ভালো, তোর পুলাপান এররকম হয় নাই। টুনু তো বাপভক্ত। তার কোনো খোঁজ আছে ?

না।

নখপড়ার ব্যবস্থা কর। নখপড়ার মাধ্যমে সব জানা যাবে।

আজহার বললেন, কোনো প্রয়োজন নাই। বাকি জীবন এই ছেলের আমি মুখ দর্শন করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাড়িতে যদি আসে পাছায় লাথি দিয়ে রাস্তায় বের করে দিব।

এটা ঠিক না। নিজের সন্তানের দিকে মুহাব্বত না দেখালে আল্লাপাক নারাজ হন।

তিনি যে নিজের সন্তানদের প্রতি যথেষ্টই মুহাব্বত দেখিয়েছেন তা জানা গেল বুধবার রাতে। ওইদিন রাতে তিনি ইমাম সাহেবের কাছে তওবা করলেন এবং ভাইকে ডেকে বললেন, একটা অন্যায় করেছি, মাফ দিয়া দে।

আজহার বললেন, কী অন্যায় করেছেন?

তোর বিষয়সম্পত্তি জাল দলিল করে দুই ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দিয়েছি। এখন মামলা মোকদ্দমা করে এই দুইজনরে তুই ঝামেলা করিস না। বড়ভাই হিসাবে তোর কাছে এইটা আমার আবদার। আমার গায়ে হাত দিয়া তুই কথা দে।

আজহার বললেন, হুঁ।

হুঁ কী? বল কথা দিলাম।

আজহার বললেন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে আপনাকে যে জমি কেনার জন্যে দিয়েছিলাম সেই জমিরও কি এই অবস্থা?

হাজি মোবারক জবাব দিলেন না।

হাজি সাহেব যে মৃত্যুর প্রস্তুতি হিসেবে তওবা করলেন তা-না। রাত বারোটার পর থেকে শুরু হবে জিন চিকিৎসা। ইমাম সাহেবের পোষা জিন কোহকাফ নগর থেকে তাঁর জন্যে ওষুধ নিয়ে আসবে। যে রোগীর এই চিকিৎসা হবে তাকে নিষ্পাপ হতে হবে। তওবার মাধ্যমে নিষ্পাপ হবার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো।

রাত বারোটায় জিনের আনা দু'টা কিসমিস খেয়ে রোগী বললেন, শরীর এখন ভালো। জ্বালাযন্ত্রণা নাই বললেই হয়। নিঃশ্বাসের কষ্ট কমে গেছে।

রাত দু'টায় তিনি মারা গেলেন।

বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দুই ছেলে এসে উপস্থিত হলো। তারা খুবই হৈচৈ শুরু করল, কারণ বাবার ঠিকমতো চিকিৎসা হয় নাই। সেবাশুশ্রূষা হয় নাই। ইত্যাদি।



দু'দিন হলো আজহার অফিসে যাচ্ছেন না। শোবার ঘরে ঝিম ধরে বসে আছেন। একটার পর একটা বিড়ি টানছেন। বিড়ির ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দিচ্ছেন। তখন গলা থেকে পশুর মতো আওয়াজ বের হচ্ছে।

তাঁর কোনো বড় সমস্যা যাচ্ছে। সমস্যার প্রধান লক্ষণ, তিনি খবরের কাগজ পড়ছেন না। কাগজ পড়া তাঁর নেশার মতো। প্রথম একবার চা খেতে খেতে কাগজ শেষ করবেন। তারপর কাগজ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যাবেন। দ্বিতীয় দফায় বাথরুমে কাগজ পাঠ হবে। সেই কাগজ অতি যত্নে ভাঁজ করে তুলে রাখা হবে। অফিস থেকে ফেরার পর কাগজ আবার পাঠ করা হবে। এমন যার নেশা তিনি কাগজ পড়ছেন না। ঘরে বাজার নেই। তিনি বাজারে যাচ্ছেন না। গত দু'দিন ডাল, ভাত আর ডিমের তরকারি দিয়ে খাবার তৈরি হচ্ছে। এই বিষয়েও তাঁর কোনো বিকার দেখা যাচ্ছে না। খেতে ডাকলে যাচ্ছেন। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। ভালো-মন্দ কিছু বলছেন না। খাবার টেবিলে বসে লবণ বেশি হয়েছে বা কম হয়েছে এই বিষয়ে তিনি কিছু বলবেন না তা হয় না।

সকাল এগারোটা। আজ বাজারে না গেলেই না। ঘরে বলতে গেলে কিছুই নেই। সালমা ভয়ে ভয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন এবং ক্ষীণ গলায় বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ ?

আজহার বললেন, না। খামাখা শরীর খারাপ হবে কী জন্যে ? শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাহাই সয়।

সালমা বললেন, দু'দিন ধরে অফিসে যাচ্ছ না। ঘরে বসে আছ।

চিন্তা করছি। কাজ করতে করতে চিন্তা করা যায় না। চিন্তার জন্যে আলাদা সময় লাগে। অবসর লাগে।

কী নিয়ে চিন্তা করছ ?

আজহার বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন, টুনুর বিষয়ে চিন্তা করছি। গাধা হোক, ছাগল হোক, সে আমাদের বড় ছেলে। তার অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখা ছাড়া উপায় নাই। কী বলো ? ঠিক বললাম কি না বলো ?

ঠিকই বলেছ।

আজহার বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, তাকে আমি ক্ষমা করলাম। তবে কাজের বিনিময়ে খাদ্য। এখন সে গ্রামের বাড়িতে চলে যাবে। আমার জমিজমা যা আছে দেখাশোনা করবে। নিজে চাষ করবে, বরগা দিবে না। তুমি কী বলো ?

সালমা কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। জমিজমা সব বেহাত হয়ে গেছে, এই খবর তিনি জানেন।

আজহার বললেন, বড় ভাইজানের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জমি বুঝে নিতে হবে। সব কাজ টুনুকেই করতে হবে। তাকে ডাকো।

ও তো ফিরে নাই।

ফিরে নাই মানে ? গেছে কোথায় হারামজাদা ?

সালমা চিন্তিত গলায় বললেন, তুমি শুয়ে থাকো। তোমার মাথায় পানি ঢালি।

আজহার বললেন, আমার মাথায় পানি ঢালাঢালির কিছু নাই। আমার জ্বর নাই। পানি ঢালতে হবে টুনু হারামজাদাটার মাথায়। You understand ?

সালমা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে যুথীর কাছে গেলেন। যুথী টিউশনির জন্যে বের হয়ে যাচ্ছিল। তাকে আটকালেন। মেয়ের কাছে ঘটনা বলতে গিয়ে ক্রমাগত চোখ মুছতে লাগলেন। যুথী বলল, মরাকান্না শুরু করার মতো কিছু হয় নাই। নতুন কেউ মারা যায় নাই। নানান ঘটনায় বাবা তবদা মেরে গেছেন। এখনই ঠিক হয়ে যাবে। আমি বাবার সঙ্গে কথা বলছি। তুমি খুব ভালো করে বাবার জন্যে আর আমার জন্যে চা বানিয়ে নিয়ে আসো।

আজহার মেয়েকে দেখে আনন্দিত গলায় বললেন, কেমন আছ মা ?

যুথী বলল, ভালো।

অফিসে যাচ্ছ ? কাজ মন দিয়ে করবে। বসের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। বসের নেকনজরে থাকার একটাই উপায়। সবসময় 'ইয়েস স্যার'। বস যদি বলে তেঁতুল টক তাহলে তেঁতুল টক। আর বস যদি বলে তেঁতুল চিনির মতো মিষ্টি তাহলে তেঁতুল চিনির মতো মিষ্টি। 'আর্গুমেন্ট উইথ বস। এল হসপস।'

যুথী বলল, বাবা, আমি অফিসে যাচ্ছি না। ওই চাকরিটা আমার হয় নাই। যে-কোনো কারণেই হোক তুমি ব্যাপারটা ভুলে গেছ। আমি টিউশনিতে যাচ্ছি। ঠিক করে বলো তো বাবা, তুমি কেমন আছ ?

ভালো আছি।

রাতে ঘুম হয়েছে ?

গতকাল রাতে ইচ্ছা করে ঘুমাই নাই। চিন্তা করেছি। সাধু-সন্ন্যাসীরা এই কাজই করেন। রাত জেগে চিন্তা করেন। তবে তাদের চিন্তা উচ্চশ্রেণীর চিন্তা। আর আমার চিন্তা সাংসারিক চিন্তা। জমিজমা, মামলা-মোকদ্দমা, পুত্র-কন্যার বিবাহ। যাই হোক, টুনুর উপর থেকে আমি রাগটা সাময়িকভাবে উইথড্র করেছি। সে যে আমার এক কথায় গ্রামে গিয়ে জমিজমা দেখাশোনা শুরু করেছে এতে আমি খুশি। Very happy. তবে আমি চাই না সে তার বড়চাচার সঙ্গে কোনো ঝামেলা করুক। মুরুব্বি মানুষের সম্মান দিতে হবে।

যুথী বলল, শার্ট-প্যান্ট পরো তো বাবা।

কেন ?

তোমাকে আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। ডাক্তার কড়া ঘুমের ওষুধ দিবে। তুমি তিন-চার দিন একনাগাড়ে ঘুমিয়ে সুস্থ হয়ে যাবে। এখন তোমার শরীর ভালো না।

জামাকাপড় তো মা পরতে পারব না। শরীর জ্বলে যাচ্ছে গরমে। এর উপর শার্ট গায়ে দেওয়া মানে চৈত্র মাসের দুপুরে কম্বল গায়ে দিয়ে রোদে শুয়ে থাকা।

সালমা ট্রেতে করে চা নিয়ে ঢুকলেন। যুথীকে বললেন, কে যেন এক ভদ্রলোক এসেছে। তোর সঙ্গে জরুরি কথা বলবে।

আজহার বললেন, সব কথাই জরুরি। তুমি যদি কুঁ করে একটা আওয়াজ দাও সেটাও জরুরি। এখন তুমি আমাকে একটা ভিজা গামছা এনে দাও। গামছা গায়ে দিয়ে বসে থাকব। গরমটা আর নিতে পারছি না। কথায় আছে—

'চৈত্র মাসের গরম
নষ্টা মাগির চেয়েও বেশরম।'

যুথী বলল, মা, তুমি বাবার সঙ্গে গল্প করো। তোমরা দু'জনে মিলে চা খাও। আমি দেখি কে এসেছে। আজ আর টিউশনিতে যাব না। সারা দিন ঘরেই থাকব। ডাক্তার আমিরুল ইসলাম সাহেবকে নিয়ে আসব। উনি যা বলেন তা-ই করব।

বসার ঘরে যিনি বসে আছেন, তাঁকে দেখে যুথী বড় ধরনের চমক খেল। টুনুকে বসে থাকতে দেখলেও সে এতটা চমকাতো না। চিকেন ফেদার কোম্পানির বড় সাহেব—আহসান।

আহসান আমতা আমতা করে বললেন, এটা আপনার বাড়ি ? আপনি যে সেই যুথী সেটা বুঝতে পারি নি।

আমি সেই যুথী মানে ?

আপনার জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি। চিঠিতে যুথী নাম লেখা। এই অর্থেই বলেছি আপনি সেই যুথী। চিঠিটা পড়ুন।

যুথী বলল, রেখে যান, পরে একসময় পড়ব।

আহসান বললেন, পরে না। এখনই পড়ুন।

যুথী বলল, আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে সেই চিঠি আমি এখন পড়ব না এক মাস পরে পড়ব সেটা তো আমি ঠিক করব। আমার কাছে এমন অনেক চিঠি আসে যেগুলি আমি পড়ি না। খুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেই।

আহসান বললেন, চিঠিটা আপনাকে দিয়েছেন শুভ্র স্যার।

যুথী বলল, প্রতিবন্ধী শুভ্রর চিঠি ? এই চিঠি পড়া না-পড়া একই। আপনি চিঠি নিয়ে যান। নিজে দশবার পড়ুন। আমি কোনোরকম আগ্রহ বোধ করছি না।

আহসান বললেন, স্যারের মা আমাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন যেন আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। খুবই জরুরি। শুভ্র স্যার নিখোঁজ হয়েছেন। ম্যাডামের মাথা খারাপের মতো অবস্থা।

যুথী বলল, আমারও মাথা খারাপের মতো অবস্থা। আমার নিজের ভাই নিখোঁজ। এটা বড় কথা না। কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আমাকে তার কাছে ছুটে যেতে হবে এটা কেমন কথা ? যিনি দেখা করতে চাইবেন, তিনি ছুটে আসবেন। আমার কথা শেষ। এখন বিদায়। বাসায় নানান ঝামেলা চলছে, আমি আর ঝামেলা বাড়াতে চাচ্ছি না।

আহসান বিনীত গলায় বললেন, প্লিজ। চলুন। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। পাঁচটা মিনিট শুধু কথা বলবেন। গাড়ি আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে।

যুথী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, Get lost.

কী বললেন ?

ইংরেজিতে বললাম, Get lost. সহজ বাংলায়—বহিষ্কার হও। সম্ভবত আপনি ভুলে গেছেন আপনি আপনার অফিস থেকে আমাকে বহিষ্কার করেছিলেন। কোনো কারণ দেখান নি। সেই তুলনায় আমি আপনার সঙ্গে অনেক ভালো ব্যবহার করেছি। আপনি যদি কানে ধরে বলেন, ক্ষমা চাই—তাহলে প্রতিবন্ধীর মা'র সঙ্গে কথা বলার বিষয়টা বিবেচনা করব। কানে ধরতে রাজি আছেন ? রাজি হওয়ার কথা না। কাজেই বহিষ্কার। বহিষ্কার।

আহসান চোখমুখ লাল করে ঘর থেকে বের হলেন। দ্রুত বের হতে গিয়ে চৌকাঠে ধাক্কা লাগিয়ে কপাল ফুলিয়ে ফেললেন।

যুথী ডাক্তার আমিরুল ইসলামকে বাসায় নিয়ে এসেছে। আজহার ডাক্তারের সঙ্গে সহজ-স্বাভাবিকভাবেই কথা বললেন। লজ্জিত গলায় বললেন, গামছা পরে আছি ডাক্তার সাহেব, কিছু মনে করবেন না। লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। কয়েকদিন আগে ইলিশ মাছের পাতুরি খেয়েছিলাম, তারপর থেকে শরীর গরম। এই গরম আর নামছেই না। ইলিশ মাছ অত্যন্ত ডেনজারাস ফিস। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মহাবীর আলেকজান্ডার ইলিশ মাছ খেয়ে মারা গেছেন ? তাঁর মতো মহাবীরের কপালে যদি এই থাকে তাহলে আমার অবস্থা বুঝতেই পারেন। আমি হচ্ছি—

'বালস্য বাল
হরিদাস পাল।'

আমিরুল ইসলাম বলল, আপনি কত রাত ঠিকমতো ঘুমাতে পারছেন না ?

বড়ভাইজানকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলাম। বারান্দায় শুয়ে থাকতে হতো। মশার কামড়। ইয়া বড় বড় Export quality মশা। তখন থেকে ঘুমের ডিসটার্ব শুরু হলো। এখন অবশ্য ভাইজান সুস্থ হয়ে গ্রামে ফিরে গেছেন। তিনি রাতে আরামে মশারির ভিতর ঘুমাচ্ছেন। আমি পড়েছি ফ্যাসাদে।

আমিরুল ইসলাম পেথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। কড়া কিছু ঘুমের ওষুধ লিখে দিল। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের নাম-ঠিকানা লিখে বলল, যুথী খালা, আমি যেসব ওষুধ দিয়েছি আমার ধারণা ব্রেইনের সাময়িক ডিসঅর্ডার এতেই দূর হবে। যদি দূর না হয় তাহলে সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

যুথী বলল, আপনার ভিজিট না নেওয়ার তিন মাস কি শেষ হয়েছে ?

এখনো শেষ হয় নি।

এক কাপ চা বানিয়ে দিলে কি খাবেন ? ভিজিট না দেওয়া গেলে রোগী এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনরা একধরনের অস্বস্তিতে ভোগে। আপনাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারলে আমার অস্বস্তি সামান্য কমত।

যুথী খালা, চা খাব।

থ্যাংক ইউ। আপনাকে একটা অনুরোধ, রসিকতার রাবারের মতো ইলাসটিসিটি নেই। রসিকতা টানতে হয় না। প্রথমবার রসিকতা করে খালা ডেকেছেন ফুরিয়ে গেছে, আর না।

Ok.

বাবার পাগলামি সারবে তো ?

অবশ্যই সারবে। ব্রেইনের রেস্ট দরকার। রেস্ট পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

যুথী বলল, খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার, এলাকায় আপনার ভালো পশার হয়েছে।

আমিরুল বলল, আশ্চর্য ব্যাপার হবে কেন?

যুথী বলল, আপনি ভিজিট নিচ্ছেন না, তারপরেও আপনার পশার—এটাই আশ্চর্য। যেসব ডাক্তার বেশি ভিজিট নেয় তাদের প্রতি রোগীদের আস্থা থাকে বেশি। রোগীরা মনে করে তিনি বড় ডাক্তার। অনেকটা আমের মতো।

আমের মতো মানে?

যুথী বলল, একই আম আপনি দু'টা আলাদা ঝুড়িতে রাখবেন। একটা ঝুড়ির আমের কেজি বলবেন সত্তুর টাকা। আরেকটার কেজি বলবেন একশ' টাকা। ক্রেতারা একশ' টাকার কেজিটাই কিনবে। দরদাম করে কিছু কমানোর চেষ্টা করবে।

আমের বিষয়ে এত কিছু জানলেন কীভাবে?

যুথী বলল, আমার বড়ভাই কিছুদিন ফলের ব্যবসা করার চেষ্টা করেছে। তার কাছে শুনেছি। চা কেমন হয়েছে?

আমিরুল বলল, চা ভালো হয় নি। চায়ের সঙ্গে গল্পগুলি সুন্দর বলে চা-টা খারাপ লাগছে না। নীপা খালার কাছে শুনেছি আপনি অদ্ভুত অদ্ভুত হিউমার করেন। আশেপাশে যারা থাকে, হাসতে হাসতে তাদের পেটে ব্যথা হয়ে যায়।

আপনি চাচ্ছেন যেন আমি আপনার পেটে ব্যথা করে দেওয়ার মতো কিছু বলি?

জি।

একটা পিঁপড়া এবং হাতি পাশাপাশি যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের বামদিকে পড়ল এক পুকুর। সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়া কষে হাতির পায়ে একটা লাথি দিল।

হাতি বলল, ঘটনা কী?

পিঁপড়া বলল, ঘটনা কী তুই বুঝস না? আমার স্ত্রী পুকুরে স্নান করছে, তুই আড়চোখে তাকাচ্ছিস। তোর লজ্জা নাই?

আমিরুল বলল, গল্পে হাসির ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলাম না। গল্পে কোনো লজিক নেই।

যুথী বলল, গল্পে লজিক অবশ্যই আছে। আপনার রসিকতা বোঝার ক্ষমতা নেই। আপনি হচ্ছেন শুভ্রর মতো।

শুভ্রটা কে?

সে একজন শিক্ষিত মানসিক প্রতিবন্ধী। আমার ধারণা আপনিও মানসিক প্রতিবন্ধী। মানসিক প্রতিবন্ধীরা রসিকতা বুঝতে পারে না। আর যারা পাগল, তারা রসিকতা বেশি বুঝে। সবকিছুতেই তারা হা হা করে হাসে।

আমিরুল বলল, আমি আরেক কাপ চা খাব।

যুথী বলল, একটু আগে বললেন, চা-টা ভালো হয় নি।

আমিরুল বলল, চা ভালো হয় নি, কিন্তু গল্পগুলি ভালো হচ্ছে। গল্প শোনার জন্যে আরেক কাপ চা খাব। এটা আমার ভিজিট।

মেরাজউদ্দিন এবং রেহানা পাশাপাশি বসে আছেন। তাদের সামনে আহসান। মেরাজউদ্দিনের ভঙ্গি শান্ত। তাঁর হাতে পাইপ। পাইপের আগুন নিভে গেছে, তারপরেও তিনি পাইপ হাতে রেখেছেন। মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরছেন। রেহানা পুরোপুরি বিধ্বস্ত। তিনি কোনোদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতেও পারছেন না। তাঁর চোখে জ্বালাপোড়া রোগ হয়েছে। চোখ সবসময় খড়খড় করছে। চোখের ডাক্তার দেখানো হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, অশ্রুগ্রন্থি থেকে ঠিকমতো অশ্রু বের হচ্ছে না বলে এই সমস্যা। চিকিৎসা হিসেবে অন্যের চোখের পানি ড্রপারে করে চোখে দিতে বলা হয়েছে। কৃত্রিম চোখের পানিও পাওয়া যায়, সেটা তেমন কাজ করে না। অনেককেই চোখের পানির কথা বলা হয়েছে। কেউ এখনো জোগাড় করে দিতে পারে নি। বাংলাদেশের মানুষ সারাক্ষণই না-কি কাঁদে। অথচ প্রয়োজনের সময় চোখের পানি নাই।

আহসানের সামনে চায়ের কাপে চা দেওয়া হয়েছে। কেক দেওয়া হয়েছে। সে চায়ের কাপে চুমুক দেয় নি। বিস্কিট স্পর্শ করে নি। তার মনের অবস্থা চা-বিস্কিট খাবার মতো না। তাকে মেরাজউদ্দিনের প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। খুব ভেবেচিন্তে জবাব দিতে হচ্ছে।

যুথী মেয়েটা তোমার সঙ্গে কঠিন এবং রূঢ় আচরণ করেছে। এবং তার শেষ কথা ছিল Get lost.

জি স্যার।

মেরাজউদ্দিন বললেন, শুভ্রকে সে প্রতিবন্ধী হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং তার চিঠি সে পড়ে নি ?

জি স্যার।

মেরাজউদ্দিন বললেন, এবং যুথী মেয়েটি বলেছে কেউ যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় সে আমার কাছে আসবে। আমি কেন তার কাছে যাব ?

জি স্যার।

এর বাইরে কিছু আছে ?

এর বাইরে কিছু নাই স্যার।

মেরাজউদ্দিন বললেন, গাড়ির ড্রাইভার বলছিল তুমি গাড়িতে ফেরার সময় বিড়বিড় করছিলে—'এত বড় সাহস। আমাকে কানে ধরতে বলে।' যুথী কি বলেছিল কানে ধরতে ?

আহসান হকচকিয়ে গিয়ে বলল, জি স্যার।

এই কথাটা আমাকে বলো নি কেন ?

বলতে লজ্জা লাগছিল স্যার।

মেরাজউদ্দিন বললেন, লজ্জা লাগারই কথা। তুমি এমন কী ভুল করেছ যে বাচ্চা একটা মেয়ে তোমাকে কানে ধরতে বলছে ? করেছ কোনো অন্যায় ?

জি-না।

মেয়েটির সঙ্গে কি তোমার কোনো পূর্বপরিচয় ছিল ? আগে কি কখনো তাকে দেখেছ ?

জি-না।

চিঠি দিতে গিয়ে তার সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় ?

জি স্যার।

মেরাজউদ্দিন রেহানার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি এক কাপ চা খাব। চা-টা তুমি নিজে বানাবে।

এই কথার অর্থ রেহানাকে এখন উঠে যেতে হবে। রেহানা উঠে গেলেন। মেরাজউদ্দিন হাত থেকে পাইপ নামিয়ে আহসানের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, অনেকগুলি বড় বড় প্রতিষ্ঠান আমি চালাই। তার জন্যে তোমার মতো চৌকষ অনেক অফিসার আমার আছে। তাদের কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে আমার ছোট্ট একটা টিম আছে। এদেরকে তুমি গুপ্তচর বলতে পার। গুপ্তচরদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার যেমন আছেন আবার অতি সামান্য পিয়ন যার কাজ চা বানানো তারাও আছে। এরা প্রতিমাসে একটা রিপোর্ট দেয়। রিপোর্টে দেখলাম যুথী মেয়েটাকে তুমি চাকরি দিয়েছিলে। সে যেদিন চাকরিতে জয়েন করতে এল, তুমি তাকে জয়েন করতে দাও নি। কারণ কী ?

আহসান বলল, পুরো ব্যাপারটা স্যার আমি ঝোঁকের মাথায় করেছি।

ঝোঁকটা তৈরি হলো কেন বলো ? অনেক অর্ধসত্য বলেছ, আর অর্ধসত্য বলবে না।

স্যার, আমার খুবই পরিচিত একজন মানুষ আছেন, তাঁকে আমরা বলি করিম আংকেল। অত্যন্ত আমুদে মানুষ। উনি একটা ছবি বানাচ্ছেন, ছবির নাম 'গুহামানব'। ছবিতে বস্তির একটি অল্পশিক্ষিত মেয়ে হঠাৎ বড় একটা চাকরি পেয়ে যায়। একমাস পর তার জয়েন করার কথা। এই একমাসে সে অনেক কিছু করে। ভালো একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়। ভাইবোনদেরকে স্কুলে ভর্তি করে। চাকরিতে জয়েন করার দিন দেখে, তার চাকরি হয় নি। সে ফিরে যায় আগের জায়গায়। বাস্তবে ঘটনা কী ঘটে তিনি জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথামতো আমি যুথীকে দিয়ে experimentটা করি।

করিম আংকেল মনে হচ্ছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ।

জি স্যার।

তাঁকে আমার অফিসে আসতে বোলো। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

জি স্যার।

মেরাজউদ্দিন হাতে পাইপ নিতে নিতে বললেন, তুমি যে অন্যায়গুলি করেছ সেই অন্যায় আমি করলে আমি অবশ্যই মেয়েটির কথামতো কানে ধরতাম। যাই হোক, তোমার সঙ্গে কথা শেষ। তুমি এখন যেতে পারো। সাদেক বসে আছে, তাকে আমার কাছে পাঠাও।

মেরাজউদ্দিন সাহেবের কয়েকজন পার্সোনাল সেক্রেটারির ভেতর সাদেক একজন। সাদেকের সব কর্মকাণ্ডই ধোঁয়াটে। সে একমাত্র কর্মচারী যার বেতন মেরাজউদ্দিন নিজে দেন।

মেরাজউদ্দিন বললেন, শুভ্র'র কোনো খোঁজ বের করতে পেরেছ?

পারি নাই স্যার।

যুথীর বিষয়ে রিপোর্টটা তৈরি হয়েছে?

জি স্যার।

সাদেক টেবিলের ওপর একটা খাম রাখল। মেরাজউদ্দিন খাম হাতে নিতে নিতে বললেন, শুভ্র'র মা অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে। তার মানসিক শান্তির জন্যে তাকে কিছু মিথ্যা কথা বলা দরকার। তুমি বলবে শুভ্র'র খোঁজ পাওয়া গেছে।

জি স্যার।

রেহানা চা নিয়ে ঢুকলেন। সাদেক বলল, আম্মা, ছোট স্যারের খোঁজ পাওয়া গেছে।

রেহানার হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেল। গরম চা ছিটকে তাঁর পায়েও পড়ল। তিনি গরমটা বুঝতেই পারলেন না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তাকে কোথায় পাওয়া গেছে বুঝিয়ে বলো।

সাদেক বলল, ময়মনসিংহে হালুয়াঘাটের কাছে। সোমেশ্বরী নদীতে একটা নৌকায় ছোট স্যার থাকেন।

রেহানা বললেন, ওই বদ মেয়েটাও কি শুভ্র'র সঙ্গে নৌকায় থাকে ?

জি-না আম্মা। সে তার ফ্যামেলি নিয়ে আরেকটা নৌকায় থাকে। রান্নাবান্না ঐ নৌকাতেই হয়। তারা নৌকা কখনো এক জায়গায় রাখে না। তবে আমাদের চোখের আড়াল হবার কোনো উপায় নেই। আমাদের একটা ইঞ্জিন নৌকা সবসময় তাদের অনুসরণ করছে।

রেহানা বললেন, আমি এক্ষুনি হালুয়াঘাট রওনা হব।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তুমি অবশ্যই রওনা হবে না। শুভ্র এসে এ বাড়িতে ঢুকবে। তার টাকাটা শেষ হলেই সে এই কাজটা করবে। তার বিষয়ে তো সব জানলে, এখন আর অস্থির হবার কিছু নেই।

মেরাজউদ্দিন খাম নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন। খামে যুথীর বিষয়ে যা লেখা—

নাম : সায়মা হোসেন যুথী।
[যুথী নামে পরিচিত]

শিক্ষা : ম্যাথমেটিক্সে অনার্স পাশ করেছে। ফলাফল প্রথম শ্রেণী। M.Sc.-তে ভর্তির টাকা জমা দিলেও ক্লাস করে নি।

পেশা : চারটা টিউশনি করে। একটি মেয়ে, তিনটি ছেলে। (তাদের বাসার ঠিকানা আলাদা সংযুক্ত)

পরিবার : একটি মাত্র ভাই, নাম টুনু। বর্তমানে নিখোঁজ। আশঙ্কা করা হচ্ছে, র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারে নিহত।

এই পর্যন্ত পড়েই তিনি সাদেককে আবারও ডাকলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, রিপোর্টে 'আশঙ্কা করা হচ্ছে', 'মনে হচ্ছে', 'ধারণা করা হচ্ছে' জাতীয় কোনো বাক্য থাকা আমার পছন্দ না। যা লেখা হবে নিশ্চিত হয়ে লেখা হবে। টুনু ছেলেটি র‍্যাবের হাতে নিহত—এই তথ্য কতটুকু সত্যি ?

পুরোটাই সত্যি। ভুলে 'আশঙ্কা করা হচ্ছে' লিখেছি।

সে কি সন্ত্রাসীদের কেউ ?

জি-না। অতি ভালো ছেলে। তবে ছোট-মজিদ তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা দু'জন একই স্কুলে পড়ত। দু'জন একই সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট ফেল করে। র‍্যাব তাকে দেখিয়েছে ছোট-মজিদের সহযোগী হিসেবে।

টুনুর পরিবারের কেউ বিষয়টা জানে না ?

না। টুনুর ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্নও না। সে প্রায়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে।

তুমি তার ব্যাপারে আরও তথ্য সংগ্রহ কোরো।

জি স্যার।

আমার ধারণা ছেলেটি সন্ত্রাসীদের একজন। অতি ভালো কোনো ছেলে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী কারও সঙ্গে ঘুরবে না। ছেলেটি কি বিবাহিত ?

জি।

তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। তার স্ত্রীই স্বামী সম্পর্কে আসল কথাটি বলতে পারবে। একটি চীনা প্রবচন আছে, "কোনো পুরুষমানুষের বিষয়ে যেসব তথ্য ঈশ্বর জানেন না, সেসব তথ্য তাদের স্ত্রীরা জানেন।"

আজ নীপার পোর্ট্রেট করা শুরু হবে। সে রাজি হয়েছে। সফিক রঙ-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে এসেছে। ছবিটি সে করবে তেলরঙে। এতে ভুল হলে ত্রুটি শোধরাবার সুযোগ থাকবে।

সফিক বলল, বিষয়টা আমি যেভাবে দেখছি তা বলি। অলস দুপুর। ঠান্ডা মেঝেতে তুমি হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছ। তোমার কাছে এক গ্লাস পানি টলটল করছে। পানির গ্লাসের কাছে একটা গল্পের বই। এই বইটা কিছুক্ষণ আগে তুমি পড়ছিলে।

কী গল্পের বই ?

ধরো শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'।

নীপা বলল, কোনো মেয়ে নেংটা হয়ে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' পড়ে না।

তাহলে টনি মরিসনের একটা বই থাকুক।

নীপা বলল, না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' বইটা থাকুক।

আচ্ছা থাকুক।

শেষ করতে কতদিন লাগবে ?

সাতদিন লাগবে।

সাতদিন তোমার সামনে আমি নেংটো হয়ে শুয়ে থাকব ?

হুঁ।

আমি একটা ভালো বুদ্ধি দেই ?

দাও।

আমার ফিগারের সঙ্গে লাইলির ফিগারের মিল আছে। তুমি যখন মুখ আঁকবে তখন আমি থাকব। অন্যসময় লাইলি থাকবে।

সে কি রাজি হবে ?

নীপা বলল, কেন রাজি হবে না ? প্রথম সেশন লাইলিকে নিয়ে করো।

পোর্ট্রেটের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। ক্যানভাসে ড্রয়িং করা হচ্ছে। সফিক বলল, লাইলি, তোমাকে অনেকবার দেখেছি। তুমি যে এতটা সুন্দর আগে বুঝি নি।

লাইলি স্বাভাবিক গলায় বলল, খোসা ছাড়ানোর আগে দেখেন নি, তাই বুঝেন নি।

সফিক বলল, অস্বস্তি লাগছে না তো ?

না। ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়লেই আমার জন্যে সুবিধা।

লাইলি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। খোলা জানালায় কিছু আলো এসে পড়েছে তার গায়ে এবং পানির গ্লাসে। পানির গ্লাস ঝলমল করছে। সফিক বলল, আমার এই ছবির টাইটেল হলো 'তৃষ্ণা'। নাম ঠিক আছে না ?

নীপা হাই তুলতে তুলতে বলল, ঠিক আছে।

সফিক বলল, লাইলির পায়ের পজিশন সামান্য চেঞ্জ করা দরকার।

নীপা বলল, চেঞ্জ করে দাও।

চেঞ্জ করলেই ঘুম ভেঙে যাবে। আমি চাই ঘুমিয়ে থাকুক। ঘুমন্ত অবস্থায় মূল ড্রয়িংটা শেষ করে ফেলি।

সফিক বলল, রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা কি তোমার কাছে আছে ? 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা। তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে। আমি বৃষ্টি বিহীন বৈশাখী দিন...'

নীপা বলল, খুঁজে দেখি।

যুথীর গানের ক্লাস আজকের মতো শেষ। অশোক বাবু আগ্রহ নিয়ে নাশতা খাচ্ছেন। সুজির হালুয়া, পরোটা এবং সিদ্ধ ডিম। চা দেওয়া হয়েছে। পিরিচ দিয়ে চায়ের কাপ ঢাকা।

অশোক বাবু ডিম মুখে দিতে দিতে বললেন, যতটুক উন্নতি আমি আশা করেছিলাম তারচেয়ে অনেক কম হয়েছে। হতাশাজনক পরিস্থিতি। সঙ্গীতে আপনার মন নাই।

যূথী বলল, কোনোকিছুতেই আমার মন নাই। খামাখা সপ্তাহে একদিন হারমোনিয়াম নিয়ে ভ্যা ভ্যা করি। আজই আমার শেষ ক্লাস। আর শিখব না।

এটা কেমন কথা!

যূথী বলল, আপনাকে বেতন টেতন কিছুই তো দিতে পারি নি। এক কাজ করুন, হারমোনিয়ামটা নিয়ে চলে যান।

অশোক বাবুর চোখ চকচক করে উঠল। তিনি চাপা গলায় বললেন, সত্যি নিয়ে যাব ?

হ্যাঁ নিয়ে যাবেন। যে বস্তুর ব্যবহার নেই সেই বস্তু ঘরে রেখে লাভ কী ?

এটা অবশ্য একটা যুক্তিসঙ্গত কথা।

যূথী বলল, হারমোনিয়াম থাকল আপনার কাছে। আবার যদি কখনো শিখতে ইচ্ছা করে আপনাকে খবর দেব।

অশোক বাবু নাশতা শেষ করে হারমোনিয়াম হাতে নিয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, রিকশাভাড়া দিন চলে যাই।

যূথী রিকশাভাড়া দিয়ে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল। কিছু ভালো লাগছে না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। তার কাছে ঘুমের ওষুধ নেই। সে তার বাবার ওষুধের বাক্স থেকে ঘুমের ওষুধ নিতে পারে। তাকে নানান ধরনের ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। তিনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সময় পার করছেন। তাঁর শরীর কতটা সেরেছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অফিসে অনেক ছুটি পাওনা ছিল। দু'মাসের বেতনসহ ছুটি নিয়েছেন। তাঁর তিরিক্ষি মেজাজ এখন ঠান্ডা। সবার সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করছেন। সালমার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করছেন। তাকে নিয়ে নিয়মিত হিন্দি সিরিয়াল দেখছেন। ট্রাজিক অংশগুলিতে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলছেন।

তবে মাঝে মাঝে বড় সমস্যা হচ্ছে। যেমন, এক রাতে হিন্দি সিরিয়াল দেখতে দেখতে তিনি হঠাৎ জড়সড় হয়ে গেলেন। ক্ষীণস্বরে সালমাকে বললেন, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। আপনি কি টুনুর শাশুড়ি ? কিছু মনে করবেন না, কিছুদিন হলো শরীর ভালো যাচ্ছে না। কিছুই মনে থাকছে না। ইলিশ মাছের পাতুড়ি খেয়ে এই সমস্যা হয়েছে। আপনি সম্ভবত জানেন না, মহাবীর আলেকজান্ডার ইলিশ মাছ খেয়ে মারা গিয়েছিলেন। বিরাট আফসোসের ব্যাপার।

যূথী ঘুমিয়ে পড়েছিল। সালমা এসে গা ঝাঁকিয়ে তাকে ডেকে তুলে বললেন, তাড়াতাড়ি বসার ঘরে যা। পুলিশ এসেছে।

কেন ?

জানি না কেন। তুই গিয়ে কথা বল।

যূথী বসার ঘরে গেল। ডিবি পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর এসেছেন। বাসার বাইরে একদল পুলিশ। মোটর সাইকেলে করে র‍্যাবের দু'জন আছে। তারা মোটর সাইকেল থেকে নামে নি। দাঁড়িয়ে থাকা মোটর সাইকেলে অলস ভঙ্গিতে বসে আছে। দু'জনের চোখেই ঘন কালো কাচের সানগ্লাস।

ডিবি ইন্সপেক্টর বললেন, আমরা আপনাদের বাসাটা সার্চ করব।

যূথী বলল, কেন?

কারণ অবশ্যই আছে। পরে জানবেন। আগে সার্চ শেষ হোক।

বাড়ি সার্চ শুরু হলো। মুহূর্তের মধ্যে সব লণ্ডভণ্ড। প্রতিটি বালিশ ছেঁড়া হলো। তোষক কাটা হলো। একটা ট্রাঙ্কের চাবি পাওয়া যাচ্ছিল না। তালা ভাঙা হলো। একজন টিভির পেছনের ডালা খুলে ফেলল। বাথরুমের ওপরের ফলস সিলিং-এ একজন উঠে গেল। ধমাধম শব্দে সেখান থেকে জিনিসপত্র ফেলতে লাগল।

আজহার ভীষণ হৈচৈ শুরু করলেন, আপনারা কী ভেবেছেন? নিরীহ পাবলিকের ওপর অত্যাচার করবে আর পাবলিক আপনাদের ছেড়ে দেবে? আমি যদি আপনাদের চাকরি নট করার ব্যবস্থা না করেছি তাহলে আমার নাম আজহার আলি না। আমার কানেকশান বিরাট বড়। প্রধানমন্ত্রীর এক ফুপুর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সেই ফুফু প্রধানমন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ। বিশ্বাস না করলে এখনই তাঁর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করব।

ডিবি ইন্সপেক্টর বললেন, যোগাযোগ করতে চাইলে করুন। আমাদের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই।

বাড়ি সার্চের ব্যাপারে একজনই আনন্দিত হলেন, তিনি সালমা। তাঁর দুভরি ওজনের একটা গলার হার হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা পাওয়া গেল। বিয়ের সময় তাঁর বড় মামা একটা মার্কার কলম দিয়েছিলেন। কলমটাও পাওয়া গেল।

ডিবি ইন্সপেক্টর যূথীকে বললেন, আপনাকে একটু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

যূথী বলল, কোথায় যাব?

আমাদের অফিসে। আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সমস্যাটা কী হয়েছে তা কি জানতে পারি?

অফিসে গেলেই জানবেন।

ডিবি ইন্সপেক্টরের সামনে যুথী বসে আছে। তাকে এক কাপ রং চা খেতে দেওয়া হয়েছে। ঘরে একটা মাত্র জানালা। জানালায় পর্দা টানা বলে বাইরের আলো আসছে না। টেবিলের ওপর একটা টেবিল-ল্যাম্প। টেবিল-ল্যাম্পের আলো যুথীর মুখের ওপর ফেলা হয়েছে। চোখেমুখে কড়া আলোর কারণে যুথী ডিবি ইন্সপেক্টরের মুখ দেখতে পারছে না।

আপনার নাম ?

সায়মা হোসেন। ডাকনাম যুথী।

বাবার নাম ?

আজহার আলি।

বাবার নামের শেষে আলি, আপনার নামের শেষে হোসেন কেন ?

বাবার ধারণা মহাবীর আলির নাম মেয়েদের নামের শেষে ব্যবহার করলে মেয়েরা বেয়াড়া হয়ে যায়।

ফোটনকে চেনেন ?

না।

ফ্রুট ফোটন নামের কাউকে চেনেন ?

না।

আপনার নাম কী ?

একটু আগে নাম বলেছি।

আমাদের প্রশ্নের ধারা এরকম। প্রথম কিছুক্ষণ এমনসব প্রশ্ন করা হয় যার সত্যি উত্তর দিতে আপনি বাধ্য। কিছুক্ষণ সত্যি বলার পর সত্যি বলাটা অভ্যাসের মতো হয়ে যায়। তখন মূল প্রশ্ন করি, যাতে সত্যি উত্তর বের হয়। এখন বলুন আপনার নাম কী ?

সায়মা হোসেন। ডাকনাম যুথী।

বাবার নাম কী ?

আজহার আলি।

মায়ের নাম কী ?

সালমা। সালমা বেগম।

ফ্রুট ফোটন আপনার কে হয় ?

আমার কেউ হয় না। এই নামে আমি কাউকে চিনি না।

আপনার বড়ভাই ফলের ব্যবসা করতেন না ?

কিছুদিন করেছেন। তার নাম টুনু। ফ্রুট ফেটিন না।

আপনার কি কোনো ব্যাংক একাউন্ট আছে?

না। তবে ভাইয়া একবার করিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যাংকে একাউন্ট খুলে টাকা জমা করার মতো অবস্থা আমাদের না।

আপনার সেই ব্যাংক একাউন্টের কাগজপত্র কার কাছে?

আমার কাছে না। ভাইয়ার কাছে।

আপনার নাম কী?

সায়মা হোসেন।

ডাকনাম?

যুথী।

বাবার নাম?

আজহার আলি।

বড়ভাইয়ের নাম?

টুনু।

আপনার ব্যাংক একাউন্টে কত টাকা আছে আপনি জানেন?

কোনো টাকা থাকার কথা না। দুই হাজার টাকা দিয়ে একাউন্ট খোলা হয়েছিল, তারপর আর টাকা জমা দেওয়া হয় নি।

আপনার ব্যাংক একাউন্টে এই মুহূর্তে আছে এক কোটি সতেরো লক্ষ তিনহাজার দুশ' টাকা।

যুথী চুপ করে রইল। তার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল।

ডিবি ইন্সপেক্টর বললেন, এটা ছাড়াও বনানীতে তিন হাজার স্কয়ার ফিটের একটা অ্যাপার্টমেন্ট কেনা আছে আপনার নামে।

আমি এইসব কিছুই জানি না। জানলে যে কষ্টের ভেতর দিয়ে সংসার চলছে তার থেকে মুক্তি চাইতাম। ব্যাংকের টাকা খরচ করতাম।

এই টাকা আপনার ভাই কীভাবে সংগ্রহ করেছেন তা জানেন?

জানি না, তবে অনুমান করতে পারছি। এবং ভাইয়া কেন কিছুদিন পরপর উধাও হয়ে যেত তাও বুঝতে পারছি। ভাইয়া কি আপনাদের হাতে ধরা পড়েছে?

সে ক্রসফায়ারে মারা গেছে।

যুথী বলল, আমি কি কিছুক্ষণ কাঁদতে পারি? না-কি আপনাদের এখানে কাঁদাও নিষেধ?

কাঁদতে পারেন।

যুথী শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ চেপে ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি এতদিন জেনে এসেছি ভাইয়া এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু মানুষের একজন।

ডিবি ইন্সপেক্টর যুথীর মুখের ওপরের লাইটটা সরিয়ে দিলেন।

আপনি কি আপনার ভাই সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু তথ্য দেবেন ?

যুথী চোখ মুছতে মুছতে বলল, এখন তথ্য দিয়ে কী হবে ?

ডিবি ইন্সপেক্টর বললেন, তথ্য সবসময় গুরুত্বপূর্ণ।

যুথী বলল, আমি তার সম্পর্কে যেসব তথ্য দেব তার কোনোটাই আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না।

তারপরেও শুনি।

ভাইয়া সুন্দর পেন্সিল স্কেচ করতে পারত। তাঁর আঁকা একটা পোর্ট্রেট আমাদের বসার ঘরে বাঁধানো আছে। এই তথ্য কি আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ?

না।

ভাইয়া একবার একটা গল্প লিখেছিল। গল্পটার নাম 'মাহিনের মৃত্যু'। গল্পটা একটা দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যপাতায় ছাপা হয়েছিল। আমার কাছে কপি আছে।

আর কিছু ?

গল্পে সে নিজের নাম দেয় নি। ছদ্মনাম দিয়েছিল। ছদ্মনাম ছিল ভৃগু সেন। এই তথ্য নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সে নিজেকে আড়ালে রাখত। আমি এক কাপ আগুনগরম চা খেতে চাই। চা কি পাওয়া যাবে ?

পাওয়া যাবে।

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। মাথাব্যথার দু'টা টেবলেট কি পেতে পারি ?

অবশ্যই। মাথা ধরার টেবলেট আনিয়ে দিচ্ছি। আপনি ওষুধ এবং চা খেয়ে বাসায় চলে যান। পুলিশের গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দেবে।

আজহার মেয়েকে দেখে বললেন, ঘটনা কী বল। পুলিশ তোকে ধরে নিয়ে গেল কেন ? বাড়ি সার্চ করল কেন ?

যুথী বলল, কে যেন পুলিশকে খবর দিয়েছে আমি বিভিন্ন জায়গায় ড্রাগ সাপ্লাই করি। ইয়াবা, গাঁজা, ফেনসি। এইজন্যেই ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছে।

আজহার বললেন, কে দিয়েছে এরকম একটা মিথ্যা খবর ?

আমি কী করে জানব ?

পুলিশকে জিজ্ঞেস করিস নাই ?

না।

গাধি মেয়ে। তোর এটা জানা দরকার না ? যা এক্ষুনি থানায় যা। জেনে আয়। তারপর দেখ আমি কী করি।

কী করবে ?

মানহানির মামলা। দশ লাখ টাকার মানহানির মামলা। ঘাড়ে গামছা দিয়ে টাকা আদায় করব। মগের মুল্লুক পেয়েছে ? This is not মগ'স মুল্লুক।

যুথী বলল, বাবা, চিৎকার কোরো না।

আজহার বললেন, এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে, তারপরেও আমি চিৎকার করব না ? মুখে চুষনি দিয়ে বসে থাকব ? You don't know your father.

যুথী অনেক সময় নিয়ে অবেলায় গোসল করল। নতুন একটা শাড়ি পরল। এই শাড়ি টুনু তাকে দিয়ে বলেছিল, বিরাট কোনো আনন্দের ঘটনা ঘটলে এই শাড়িটা পরবি। আজ কি যুথির জীবনের খুব আনন্দের কোনো দিন ? অবশ্যই না। তারপরেও এই শাড়িটা সে কেন পরল নিজেও জানে না। মানুষের অনেক কর্মকাণ্ডই যুক্তিছাড়া।

পুলিশ যুথীর ঘরও লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। ঘর গোছাতে হবে। ইচ্ছা করছে না। এই মুহূর্তে মন চাইছে ভাইয়ের লেখা 'মাহিনের মৃত্যু' গল্পটা পড়তে। গল্পটা খুঁজে বের করতে ইচ্ছা করছে না।



দৈনিক ভোরের কাগজের সাহিত্যপাতায় প্রকাশিত টুনুর লেখা গল্প।

মূল উপন্যাসের সঙ্গে এই গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। যারা মূল উপন্যাসে থাকতে চান, তারা এই অধ্যায়টা বাদ দিতে পারেন।

মাহিনের মৃত্যু

ভৃগু সেন

রাত দশটা থেকে দশটা পাঁচ এই সময়ের মধ্যে মাহিনের মৃত্যু হবে। এই তথ্য সে জানত। তাকে সন্ধ্যা ছ'টায় মোবাইল ফোনে জানানো হয়েছে। টেলিফোন পাওয়ার পর তার সামান্য শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। সে হাঁ করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল। মাহিনের স্ত্রী শেফালী বলল, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে ?

মাহিন মুখে কিছু বলল না, হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

শেফালী বলল, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ?

হুঁ।

বেশি ?

না বেশি না।

কতবার বলেছি একজন ডাক্তার দেখাও। আমার কোনো কথা তুমি শোনো না। বুকে তেল মালিশ করে দিব ?

না। ঠান্ডা এক গ্লাস পানি খাব। খুব ঠান্ডা।

শেফালী বলল, ফ্রিজের মনে হয় গ্যাস চলে গেছে। ঠান্ডা হয় না। পাশের ফ্ল্যাট থেকে এনে দেই ?

লাগবে না।

কেন লাগবে না! ঠান্ডা পানি নিয়ে আসছি।

শেফালী পানির বোতল নিয়ে এসেছে। মাহিনের হাতে পানির গ্লাস। এমনিতেই পানি ঠান্ডা, তারপরেও গ্লাসে দু'টা বরফের টুকরা ভাসছে। মাহিন বরফের টুকরা দু'টার দিকে তাকিয়ে আছে।

শেফালী বলল, গ্লাস হাতে নিয়ে বসে আছ, চুমুক দিচ্ছ না কেন ?

মাহিন পানির গ্লাসে চুমুক দিল। পানি তিতা লাগছে। মৃত্যুর আগে পানি তিতা লাগে—এই কথা সে শুনেছে। বাস্তবেও যে লাগে তা জানা ছিল না। পানি শুধু যে তিতা লাগছে তা-না, রসুন রসুন গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

শেফালী বলল, শ্বাসকষ্টটা কি কমেছে ?

মাহিন বলল, হুঁ।

শেফালী বলল, ভিডিওর দোকান থেকে একটা ছবি এনেছি। দেখবে ? অনেকদিন আমরা একসঙ্গে ছবি দেখি না।

মাহিন বলল, ছবি দেখব। কী ছবি ?

গজনি। মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। খুব না-কি ভালো ছবি।

হিন্দি ?

হুঁ হিন্দি।

আমি তো হিন্দি বুঝি না।

শেফালী বলল, আমি বুঝিয়ে দেব।

মাহিন বলল, আচ্ছা। বাবু কখন আসবে ?

শেফালী বলল, এগারোটার দিকে বড় ভাইজান বাবুকে নামিয়ে দিবেন। সে খুব মজা করছে। সবাইকে ছড়া শোনাচ্ছে।

বাবু ছড়া জানে না-কি ?

শেফালী বলল, তুমি তো ঘরেই থাকো না। বাইরে বাইরে ঘোরো। বাবু কত কী যে শিখেছে! বানিয়ে বানিয়ে গানও গায়।

কী গান ?

শেফালী তার আড়াই বছরের ছেলের গান ছেলের মতো করে গেয়ে শোনাল—

মামণি ভালো
বেশি ভালো
অনেক ভালো
বনেক ভালো।

মাহিন বলল, বনেক ভালোটা কী ?

শেফালী বলল, বানিয়ে বানিয়ে বলছে। তোমার ছেলে যে বানিয়ে বানিয়ে কত কথা বলে। মনে হয় বড় হয়ে কবি হবে।

মাহিন হঠাৎ বলল, তোমাকে সুন্দর লাগছে।

শেফালী লজ্জা পেয়ে গেল। মাহিন এই ধরনের কথা কখনো বলে না। বাসাতেই থাকে না, কথা কখন বলবে!

মাহিন ঘড়ি দেখল। সাতটা বাজে। এখনো হাতে তিনঘণ্টা সময় আছে। এর মধ্যে ছবি দেখে ফেলা যায়। তার মাথায় পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা আসছে না। তার 'বস' এমন জিনিস যে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসে থাকলে সেখান থেকেও ধরে নিয়ে আসবে। বসের সঙ্গে যে দু'নম্বরিটা সে করেছে তা কারোরই ধরতে পারার কথা না। বস ঠিকই ধরেছে এবং শাস্তির ব্যবস্থা করেছে।

শেফালী বলল, সব রেডি করেছি। এসো ছবি দেখি।

মাহিন বলল, কাছে আসো, তোমার সঙ্গে জরুরি আলাপ আছে।

শেফালী চিন্তিত মুখে এগিয়ে এল। মাহিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তোমার নামে একটা ব্যাংক একাউন্ট আছে। ব্র্যাক ব্যাংক। মিরপুর শাখা। একাউন্ট নাম্বার টেলিফোন বুকে লেখা আছে।

শেফালী অবাক হয়ে বলল, আমার নামে ব্যাংক একাউন্ট?

হ্যাঁ। সেখানে অনেক টাকা জমা আছে। আমার ভালোমন্দ কিছু হলে সেই টাকা ব্যবহার করবে।

তোমার ভালোমন্দ কিছু হবে কেন?

মানুষের ভালোমন্দ যে-কোনো সময় হয়। বিছানায় শুয়ে হার্টফেল করে মানুষ মরে যায় না? চলো ছবি দেখি।

ছবি চলছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছে শেফালী। স্বামীকে হিন্দি ডায়ালগ তার বুঝিয়ে দেওয়ার কথা। সে এতটাই মুগ্ধ যে স্বামীর দিকে তাকাচ্ছেও না। মাহিন তাকিয়ে আছে স্ত্রীর দিকে। তার স্ত্রী এত সুন্দর তা সে আগে কখনো লক্ষ করে নি। শেফালী হাসলে গালে টোল পড়ে তাও লক্ষ করে নি। তার ইচ্ছা করছে স্ত্রীর গা ঘেঁসে বসতে। কিন্তু কেন জানি লজ্জা লাগছে।

ছবি শেষ হবার পরপরই গেট থেকে দারোয়ান ইন্টারকমে জানাল— ইসকান্দর নামে একজন তার বন্ধু নিয়ে এসেছে। এদের ঢুকতে দিবে কি না?

মাহিন বলল, ঢুকতে দাও।

শেফালী বলল, কে এসেছে?

মাহিন বলল, তুমি শোবার ঘরে যাও।

শেফালী আবার বলল, কে এসেছে?

মাহিন বলল, কে এসেছে তোমার জানার দরকার নাই। তুমি তোমার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসো।

ইসকান্দর এবং তার সঙ্গী হামিদ বসার ঘরে ঢুকেছে। হামিদ সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মাহিনের পাশে এসে দাঁড়াল। ইসকান্দর বলল, খবর কিছু পেয়েছেন ?

মাহিন বলল, কী খবর ?

বস-কে তো শেষ করে দিয়েছে।

কখন ?

ইসকান্দর গলা নামিয়ে বলল, কখন সেটা জানি না। বস আমাকে বিকাল পাঁচটায় টেলিফোন করে বলল, অস্ত্র নিয়ে রাত ন'টায় তার কাছে যেতে। তিনি অপারেশনে পাঠাবেন। একজনকে শেষ করতে হবে। ন'টার সময় বসের কাছে গিয়ে দেখি—তিনি মরে পড়ে আছেন। কপালে গুলি, পেটে গুলি, বুকে গুলি।

মাহিন সিগারেট ধরাল। হামিদ বলল, ওস্তাদ এখন আপনিই আমাদের বস। কী করব বলেন।

মাহিন সিগারেটে টান দিতে দিতে বলল, আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাও। সাতদিন ঝিম ধরে থাকো।

ইসকান্দর বলল, বস তাহলে চলে যাই ?

মাহিন বলল, যাও।

তারা চলে গেল। মাহিন শোবার ঘরে ঢুকে শেফালীকে বলল, ছবিটা আমি বুঝতে পারি নাই। তোমার বুঝিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। তুমি বুঝাও নাই। ছবিটা আবার ছাড়ো।

ছবি শুরু থেকে চলছে। মাহিন স্ত্রীর হাত ধরে বসে আছে। মাথার ওপর ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরছে। শেফালীর চুল এসে মাহিনের চোখে-মুখে লাগছে। কী মিষ্টি গন্ধ সেই চুলে!

মুন্সিগঞ্জের দক্ষিণে পদ্মায় যে বিশাল চর জেগেছে, শুভ্র আছে সেখানে। সে খাটো করে লুঙ্গি পরেছে। গায়ে কুচকুচে কালো রঙের গেঞ্জি। পায়ে রাবারের লাল জুতা। সে নৌকায় বসা, হাতে ছিপ। নৌকা খুঁটি দিয়ে আটকানো। জোয়ারে পানি বাড়ছে। নৌকা দুলছে। শুভ্রর দৃষ্টি ফাতনার দিকে। তিনটা ছিপ সে ফেলেছে। একটা হাতে নিয়ে আছে। মাছ বড়শি ঠোকরাচ্ছে, কিন্তু গিলছে না। মাছ মারার বিষয়টা সে এখনো রপ্ত করতে পারে নি। এখন পর্যন্ত সে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে পারে নি। তার ধারণা আজ একটা অঘটন ঘটবে।

চরে শুভ্রকে সবাই চেনে 'ধলা মিয়া' নামে। গায়ের রঙের জন্যে তার নাম ধলা। তবে রোদে পুড়ে তার গায়ের রঙ ঝলসে গেছে। শরীরের পেলবতার কিছুই অবশিষ্ট নেই। চরের অন্য মানুষদের থেকে তাকে আলাদা করা কঠিন। গত পরশু মাথার উকুনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে মাথা কামিয়েছে। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। গতকাল থেকে তাকে ডাকা হচ্ছে 'মাথা ছিলা ধলা মিয়া'। চরাঞ্চলে মানুষের নাম এবং পরিচয় দ্রুত বদলায়।

হঠাৎ শুভ্রর নৌকা দুলে উঠল। ছাতি মাথায় অচেনা একজন নৌকায় উঠে এসেছে। তার থুতনিতে সামান্য দাড়ি। মাথায় কিস্তি টুপি। তার গা থেকে সস্তা আতরের গন্ধ আসছে।

আপনি ধলা মিয়া না ?

শুভ্র বলল, জি, আমি মাথা ছিলা ধলা মিয়া।

কী করেন ?

মাছ ধরার চেষ্টা করছি।

আপনি কি আমারে চিনেন ?

শুভ্র বলল, না। চিনি না।

চরের সবাই আমারে চিনে, আপনি চিনেন না, এইটা কেমন কথা! আমার নাম হারুন, এখন চিনেছেন ?

হ্যাঁ, এখন চিনেছি। আমি আপনাকে অত্যন্ত বলশালী কেউ ভেবেছিলাম। আপনি রোগাপাতলা মানুষ ভাবি নি।

হারুন বলল, আপনার মুখের ভাষা ঢাকা শহরের মতো। আপনি কি ঢাকার লোক ?

হ্যাঁ, আমি ঢাকার।

ঢাকার লোক চরে কেন ?

বোনের সঙ্গে এসেছি।

মর্জিনা আপনার বোন ?

জি।

বোনের সঙ্গে আসছেন কী কারণে ?

শুভ্র বলল, ভাই বোনের কাছে আসবে না ?

হারুন বলল, আসছেন ভালো কথা। কিছুদিন চরের বাতাস খেয়েছেন, এইটাও ভালো। চরের বাতাসে ভাইটামিন আছে। শরীরে ভাইটামিন পড়েছে, এখন বোন নিয়া বিদায় হয়ে যান।

শুভ্র বলল, বিদায় হব কেন ? পদ্মায় যাদের জমি চলে গেছে তারাই চরে জমি পেয়েছে। কাগজপত্র দেখিয়ে আমরা দখল নিয়েছি। সরকারি লোক দখল দিয়েছে।

হারুন গলায় ঝুলানো পেতলের খিলাল দিয়ে দাঁত খিলাল করতে করতে বলল, চরে কোনো সরকার নাই। চরে আমরাই সরকার। আমি হুকুম দিলাম, তিন দিনের মধ্যে চর ছাড়বেন। যদি না ছাড়েন কী হবে শুনতে চান ?

শুভ্র বলল, শুনতে চাই না, তবে বলতে চাইলে বলতে পারেন।

হারুন বলল, আপনার লাশ পানিতে ভাসবে।

শুভ্রর ছিপের একটা ফাতনা ডুবে গেছে। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে সে ছিপ টানল এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখল, মধ্যম আকৃতির একটা বোয়াল মাছ বরশিতে বিঁধেছে। মাছটা তার প্রাণশক্তিতে ছটফট করেই যাচ্ছে। সূর্যের আলোতে সে ঝলমল করছে। শুভ্র প্রাণপণে চেঁচাল, মাছ ধরে ফেলেছি! মাছ ধরে ফেলেছি!

হারুন বলল, মাছ ভালোই ধরেছেন। এই বোয়ালের নাম কালিবোয়াল, এর স্বাদ অদ্ভুত।

শুভ্র বলল, এই বোয়ালটা আপনি নিয়ে যান।

হারুন বলল, আমি নিয়া যাব ? দুই পয়সার বোয়াল দিয়া আমারে খুশি করা যাবে না। আপনারে তিন দিন সময় দিয়েছি, বোয়াল মাছের কারণে এক মিনিট সময় বেশি পাবেন। তিন দিন এক মিনিট। এর মধ্যে আসসালামু আলায়কুম বলবেন।

শুভ্র বলল, এক মিনিট সময় বেশি পাবার জন্যে মাছটা আপনাকে দিতে চাচ্ছি তা না। আমি মাছ ধরে যতটা আনন্দ পেয়েছি, আপনি আমার মাছ ধরা দেখে ততটাই আনন্দ পেয়েছেন। আপনার চোখ ঝলমল করে উঠেছিল, এইজন্যেই দিচ্ছি।

হারুন বলল, আপনি বিরাট চালাক লোক, তবে চালাকিতে কাজ হবে না।

হারুন সিগারেট ধরাল।

শুভ্র বলল, আপনার কথা কি আরও বাকি আছে ?

হারুন বলল, কথা যা বলার বলে ফেলেছি। এখন আপনার মাছ ধরা দেখি। হারুনের কথা শেষ হবার আগেই শুভ্রর ছিপে একটা রুই মাছ ধরা পড়ল।

হারুন বলল, ধলা মিয়া! আপনি ভাগ্যবান মানুষ। এই বড়শিতে এত বড় রুই মাছ ধরা পড়ে না। সিগারেট খাবেন ?

সিগারেট খাই না।

হারুন বলল, আপনি একটা বোয়াল মাছ দিলেন, আমি নিলাম। আমি সিগারেট দিলাম, আপনি নিবেন।

শুভ্র বলল, বোয়াল মাছ আপনি খান। সিগারেট আমি খাই না। কাজেই নিব না।

হারুন বোয়াল মাছ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, সময় তিন দিন এক মিনিট। মনে থাকে যেন।

শুভ্র জবাব দিল না। সে একদৃষ্টিতে ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মন বলছে আরেকটা মাছ ধরা পড়বে। মাছের সংখ্যা হবে তিন। তিন একটি প্রাইম সংখ্যা। পিথাগোরাসের মতে, অতি রহস্যময় সংখ্যা। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের প্রতীক। পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্যের প্রতীক। তিন হচ্ছে আমি, তুমি, সে। পিতা, মাতা ও সন্তান।

চরের লোকজন সবাই শুভ্রকে চিনে আধাপাগল মানুষ হিসাবে। আধাপাগলরা পথের ফকির হয়, ধলা মিয়া পথের ফকির না। সে অনেককেই ঘর বাঁধার বাঁশ কিনে দিয়েছে। চরে দু'টা টিউবওয়েল বসিয়েছে। একটা স্কুলঘর তৈরি হচ্ছে।

স্কুলঘরে চরের ছেলেমেয়েরা যাবে। পড়াশোনা করবে। তাদের জন্যে একজন শিক্ষকও জোগাড় হয়েছে। বাবু নলিনী বসাক। তিনি আগে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। নদীভাঙনের শিকার হয়ে ঢাকা শহরে বাচ্চাদের খেলনা এবং বেলুন বিক্রি করতেন। চরাঞ্চলে সবারই মূল নামের বাইরে আরেকটা নাম থাকে। বসাক স্যারের সেই নাম হচ্ছে 'পাইখানা স্যার'। কোনো একটি বিচিত্র কারণে তিনি স্যানিটারি পায়খানা নিয়ে বিশেষভাবে উত্তেজিত। রিং এবং স্লাভ বসিয়ে কীভাবে স্যানিটারি পায়খানা তৈরি করতে হয় তা তিনি জানেন। এবং সবাইকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া পবিত্র দায়িত্ব মনে করেন। এইখানেই 'পাইখানা স্যার' নামকরণের সার্থকতা।

চরের সবচেয়ে দুর্বল, অশক্ত এবং রুগ্ন মানুষটার নাম 'কল্লাকাটা'। সে কথায় কথায় বলে, কোন বান্দিরপুত চর থাইকা আমারে সরাইব ? কল্লা কাইটা ফেলুম। কল্লাকাটার কাছে শুভ্র দেবতাদের একজন। শুভ্র সম্পর্কে সামান্য বিরূপ কোনো কথা বললে সে চেঁচিয়ে বলে, ধলা মিয়া বিষয়ে একটা অন্ধমন্দ কথা কেউ বলছ কি কল্লা কাইটা ফেলুম।

চরে চার-পাঁচটা দোকান চালু হয়েছে। একটা চায়ের স্টল বসেছে এবং তারা ভালো ব্যবসা করছে।

শুভ্র ঠেকে ঠেকে শিখছে। তার প্রধান শিক্ষা, কেউ কোনো স্বার্থ ছাড়া কিছু করতে চায়—এই বিশ্বাস চরের মানুষদের নেই। শুভ্রর স্বার্থ কী তারা বুঝতে পারছে না বলেই শুভ্রর বিষয়ে তাদের সন্দেহ দূর হচ্ছে না, বরং বাড়ছে।

তিনটা মাছ ধরার কথা। শেষ মুহূর্তে তিন নম্বর মাছ ধরা পড়ল। ফলি মাছ। মাছ ছোট, কিন্তু তার প্রাণশক্তি দেখার মতো। শুভ্র মুগ্ধ হয়ে মাছের ঝাঁপাঝাঁপি দেখে বড়শি খুলে মাছটা ছেড়ে দিল।

মর্জিনা নৌকায় উঠতে উঠতে বলল, ভাইজানের বিষয় কী ? বর্শেল হইছেন কবে ? শেষপর্যন্ত মাছ ধরছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

শুভ্র বলল, মাছ মারার বিষয়টা খুবই এনজয় করছি। চিন্তা করার সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো ছিপ ফেলে বসে থাকা। দুই ধরনের ছিপ ফেলতে হবে, মাছের ছিপ এবং চিন্তার ছিপ। মাছের ছিপে মাছ ধরা পড়বে। চিন্তার ছিপে চিন্তা।

মর্জিনা বলল, আপনার পাগলা কথা কিছুই বুঝি না। আইজ চিন্তা কইরা কী পাইছেন ?

শুভ্র বলল, আজ চিন্তা করে পেয়েছি চরে কারও আলাদা করে কিছু থাকবে না। এখানে সবকিছুই সবার। অনেকগুলি নৌকা থাকবে। নৌকায় মাছ ধরা হবে।

নৌকাও সবার, মাছের মালিকানাও সবার। ফসল যা হবে সেখানেও সবার সমান ভাগ। কমিউনিস্টটাইপ চিন্তা।

মর্জিনা বলল, পাগলা চিন্তা বাদ দেন। আপন দুই ভাই একত্রে থাকতে পারে না। সবে মিল্যা একত্রে থাকবে! নদীতে একটা ডুব দিয়া মাথা ঠান্ডা কইরা আসেন। মাছ নিয়া যাইতেছি, নিজের হাতে মাছ রানব। দেখি আমার ভাইজানের মাছের সোয়াদ কেমন। নদীর ভিতরে বেশিদূর যাইয়েন না। সাঁতার জানেন না কিছু না। ডুইব্যা মরবেন।

শুভ্র বলল, সাঁতার শিখে ফেলব মর্জিনা। অনেকখানি শিখেছি। মাথা ডুবিয়ে দুই মিনিট ডুবে থাকতে পারি। মাথা তুললেই পারি না।

শুভ্র নদীতে নেমে গেল। তার মনে হলো, স্রোতে গা ভাসানের আনন্দের কাছে সব আনন্দই তুচ্ছ। মাথার ওপরে গনগনে রোদ। নদীর পানি হিমশীতল। নদীতে নেমে শুভ্রর মাথায় আরেকটা চিন্তা চলে এল। তার কাছে মনে হলো নদীগুলি হচ্ছে আর্টারি আর সমুদ্র হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ড সচল রাখার জন্যেই নদী।

চরের চায়ের দোকানের চাওয়ালার নাম হেকমত। অতি ধুরন্দর মানুষ। সে একই সঙ্গে হারুনের ঘনিষ্ঠজন এবং ধলা মিয়ার ঘনিষ্ঠজন। চরের বেশ কিছু জমি এখন তার দখলে। সে জমি চাষাবাদ শুরু করেছে। চিনা বাদাম এবং বাঙ্গির বীজ পুঁতেছে। চরের মাটিতে এই দুই জিনিস ভালো হয়। হেকমতের বয়স চল্লিশের ওপর। এখনো বিয়ে করে নি। সে ঠিক করেছে, জমির দখলের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হলেই বিয়ে করে ফেলবে। চরের জমি হলো বাজারের মেয়েমানুষ। ঘনঘন দখল বদলায়। হেকমত ঠিক করেছে গুছিয়ে বসলে চরের কোনো মেয়েকেই বিয়ে করবে। এরা যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারে। বেশ কয়েকটি মেয়ের দিকে তার লক্ষ আছে। এদের মধ্যে মর্জিনাকে তার বিশেষ পছন্দ। মর্জিনার বয়স অল্প, রূপবতী। সে তার বাড়িঘরও সুন্দর করে গুছিয়েছে। মর্জিনার বাপের যে বয়স এবং শরীরের যে অবস্থা তাতে মনে হয় না বেশিদিন টিকবে। তখন মর্জিনার বিষয়ও চলে আসবে তার হাতে। একটাই সমস্যা—ধলা মিয়া। ধলা মিয়ার সঙ্গে মর্জিনার ভাইবোন সম্পর্ক, এটা হেকমত বিশ্বাস করে না। মায়ের পেটের ভাইবোন হলো ভাইবোন। বাকি সব ভাইবোন 'সেক্সের' সুবিধা নেওয়ার ভাইবোন। হেকমত ঘাস কাটা গরু না। সে সব বুঝে। ধলা মিয়াকে চরছাড়া করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পরপুরুষের সঙ্গে বোন সেজে সম্পর্ক যে মেয়ের, তাকে বিবাহ করা কঠিন। তবে এই বিয়েটা সে করবে স্বার্থের কারণে। মর্জিনা বাদির মতো সংসারে

খাটবে। সংসারের আরো উন্নতি হবার পর সে দেখেশুনে ভালো একটা মেয়ে বিবাহ করবে। সংসার থাকবে সেই মেয়ের হাতে। মর্জিনার পরিচয় হবে বান্দি বউ। চর অঞ্চলে এটা নতুন কিছু না। চর অঞ্চলে একেক পুরুষের তিন-চারটা বউ থাকে। তারও থাকবে। এক বউ হলো সুন্দরের জন্যে। সে সেজেগুজে থাকবে। পায়ে আলতা, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক। বাকি বউরা হবে কামলা বউ।

হেকমত চুলা নিভিয়ে দিল। ভরদুপুরে কেউ চা খেতে আসে না। ভাত খেয়ে এখন সবাই ভাতঘুম দিবে। হেকমতের ঘরে ভাত রাঁধার কেউ নাই। নিজের ভাত তাকে নিজেকেই রাঁধতে হবে।

শুভ্র দুপুরের খাবার খেয়ে শুয়েছে। দুপুরের খাবার তাকে একা খেতে হয়েছে। মর্জিনার বাবা ইয়াকুব জ্বরে কাতর। সে ঘরে শুয়ে কাতরাচ্ছে। মর্জিনা বাবার ঘরে উঁকি পর্যন্ত দিচ্ছে না। শুভ্র পাটি পেতে শুয়েছে পাকুরগাছের নিচে। চরের গাছপালা দ্রুত বড় হয়। পাকুরগাছ ভালোই বড় হয়ে ছায়াদায়িনী বৃক্ষ হয়ে গেছে। সে তার পছন্দের বই চোখের সামনে ধরে আছে। বইটা ভারী। হাত দিয়ে ধরে রাখতে কষ্ট হয়। তার চোখে ঘুম। গরম বাতাস বইছে। ঠান্ডা বাতাসে ঘুম কেটে যায়। গরম বাতাসে ঘুম আসে। অথচ উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল।

শুভ্র প্রাণপণে চোখ খোলা রাখতে চেষ্টা করছে। বইয়ের লাইনগুলি অস্পষ্ট হয়ে আসছে—

> Twelve more years passed. Each year the Bagginses had given very lively combined birth day-parties at Bag End; but now it was understood that some thing quite exceptional was being planned for the Autumn.

ভাইজান! চোখ বন্ধ কইরা বই পড়েন ক্যামনে?

শুভ্র হাত থেকে বই নামাতে নামাতে বলল, চোখ খুলেই বই পড়ছিলাম। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে।

মাথার চুল টাইন্যা ঘুম পাড়ায়া দেই?

শুভ্র বলল, আমার মাথায় চুল কোথায় যে টানবে?

মর্জিনা বলল, তাও তো কথা। পা টিপ্যা দিব?

উঁহু। এমনিতেই ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তাছাড়া কেউ গায়ে হাত দিলে আমার ভালো লাগে না।

ভালো লাগে না কী জন্যে ?

শরীর খুবই ব্যক্তিগত জিনিস। সেটা থাকবে সেভাবেই।

তাও ঠিক। ভাইজান ঘুমান। আমি আপনার কাছে বইসা থাকি।

বসে থাকতে হবে না।

দূরে বইসা থাকব। চিন্তা কইরেন না ভাইজান, শইলে হাত দিব না।

শুভ্র ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল, সে পরীক্ষার হলে বসে আছে। তার হাতে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়েছে। ফিজিক্সের বদলে ইংরেজি সাহিত্যের প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন : Write an essay on Tolkien's Lord of the Rings. সে লেখা শুরু করতে গিয়ে দেখল, চশমা আনতে ভুলে গেছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

মর্জিনা গ্লাস নিয়ে হেকমতের চায়ের দোকানে গিয়েছে। গ্লাস ভর্তি করে চা নিয়ে আসবে। ঘুম ভাঙলে সে ভাইজানকে গরম গরম চা দেবে। হেকমতের দোকানের চা ভাইজানের পছন্দ।

গ্লাসে চা ঢালতে ঢালতে হেকমত বলল, তোমার যে ভাই ধলা মিয়া সে কেমন ভাই ?

মর্জিনা বলল, ভাই যেমন হয় তেমন।

তারে পাইলা কই ?

আচানক ঘটনা। শুনলে শইলের লোম খাড়া হয়া যায়। শুনতে চান ?

চাই।

একদিন সইন্ধ্যাকালে বিরাট ঝড় উঠছে। এমন ঝড় আমি আমার জন্মে দেখি নাই। গাছের ডাল ভাইঙ্গা পড়তাছে। শুরু হইছে বৃষ্টি। হঠাৎ দূরে ঠাডা পড়ল। ঠাডার শব্দের সাথে ধুপুস কইরা এক শব্দ। তাকায়া দেখি, আসমান থাইক্যা চাউলের বস্তার মতো কী জানি পড়ছে। কাছে গিয়া দেখি মানুষ। আমি বললাম, আপনি কে ? মানুষটা বলল, আমি তোমার ভাই। আমার নাম মাথাছিলা ধলামিয়া। এই হইল ঘটনা।

হেকমত বলল, তুমি পাজি মেয়েছেলে। তোমারে যে বিবাহ করবে, তার কপালে দুঃখ আছে।

মর্জিনা বলল, কথা সত্য। এই কারণে ঠিক করেছি বিবাহ করব না। অন্যেরে দুঃখ দিয়া লাভ কী ?

মর্জিনা উঠতে যাচ্ছিল, হেকমত বলল, বসো। এক কাপ চা খাও, দাম লাগবে না। মাগনা।

মর্জিনা বসল। তার ঠোঁটের কোনায় হাসি। চেষ্টা করেও সে হাসি গোপন করতে পারছে না।

হেকমত বলল, হাসো কেন ?

আপনার ভাব দেইখা হাসি। আপনার ভাব ভালো না। অনেকদিন মেয়ে মাইনষের শইলের গন্ধ না পাইলে পুরুষের যেমন অবস্থা হয় আপনের তেমন অবস্থা।

তুমি তাহলে ভাবও বোঝ ?

পুরুষের ভাব বুঝে না এমন মেয়েছেলে আল্লাপাক পয়দা করেন না।

তুমি তো অন্যের পয়সায় ভালো সংসার পাতছ। গাইগরু কিনতেছ শুনলাম।

মর্জিনা বলল, গাইগরু কিনব না। মহিষ কিনব। মহিষের বাথান দিব।

হেকমত বলল, গরু মহিষ না কিনাই ভালো। হারুন সাব যখন ধাক্কা দিব তখন গরু মহিষ নিয়া পালাইতে পারবা না।

পালাইতে না পারলে আপনেরে দিয়া যাব। খবর পাই, আপনে উনার প্রিয় লোক। আপনেরে তো ধাক্কা দিব না।

চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কই শিখেছ ? তোমার ভাইজানের কাছে ?

মর্জিনা বলল, উঠি। চা শেষ।

হেকমত বলল, চায়ের তিয়াস লাগলে চইল্যা আসবা। চা খায়া যাবা। তিয়াস চাইপা রাখা ঠিক না।

মর্জিনা বলল, বিরাট জ্ঞানের কথা বলেছেন গো। তিয়াস চাইপা রাখা ঠিক না। আপনেও চাইপা রাইখেন না। উত্তর চরে নটিবেটিরা কয়েকটা চালাঘর তুলছে। সেইখানে যান। চায়ের দোকানের লাভের কিছু টাকা দিয়া আসেন।

সন্ধ্যার পর এখানে গানের আসর বসে। একজনই গায়ক—কল্লাকাটা। তার গলায় সুর আছে। তবে হাঁপানির টান উঠলে গান এলোমেলো হয়ে যায়। সে গান থামায় না। হাঁপানির টান কমানোর চেষ্টা করে। শ্রোতারা কেউ কিছু মনে করে না।

কল্লাকাটা গানের সময় ডান পায়ে নুপূর পরে নেয়। পা ঝাঁকিয়ে তাল দেয়। হারমোনিয়াম আছে, হারমোনিয়াম বাজানোর লোকও আছে। ঢোলবাদক বেশ কয়েকজন আছে। তারা টিনের ক্যানাস্তারায় বাড়ি দিয়ে তাল দেয়। শুভ্র গানের দলকে ঢোল, বেহালা এবং নতুন হারমোনিয়াম কেনার টাকা দিয়েছে। সামনের শুক্রবারে মুন্সিগঞ্জ থেকে বাদ্যযন্ত্র কেনা হবে।

গানের আসর তেমন জমছে না। হারুন এসে ঘুরে গেছে—এই আতঙ্কেই সবাই অস্থির। বোঝাই যাচ্ছে চরে মারামারি শুরু হবে। কখন হবে সেটাই কথা। হারুন জেলে ছিল, অল্প কিছুদিন হলো ছাড়া পেয়েছে। সে এমপি সাহেবের আপনা লোক—এটাই সমস্যা।

চরে মিটিং করে এমপি সাহেব নিজে বলেছিলেন, 'চর দখলের সংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। লাঠি যার চর তার—এই পুরনো স্লোগানে আমরা বিশ্বাস করি না। পদ্মা যাদের জমি কেড়ে নিয়েছে শুধু তারাই জমি পাবে। আর কেউ না। বিলিব্যবস্থা আমি নিজে দেখব। যেন কোনো বিশৃঙ্খলা না হয় তার জন্যে চর এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। আসুন ভেদাভেদ ভুলে আমরা সবাই একত্র হয়ে সোনার বাংলা গড়ি।'

সেই সাংসদ এখন উল্টে গেছেন। পুলিশ ফাঁড়ি উঠে গেছে। এমপি সাহেবের পেয়ারা আদমি হারুন কিছু লোকজন নিয়ে চর মেপে বেড়াচ্ছে। চরে দখল পাওয়া অর্ধেকের মতো মানুষকে উঠে যেতে বলা হয়েছে।

বাবু নলিনী বসাকের নেতৃত্বে একদল চরের মানুষ মাননীয় সাংসদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। মাননীয় সাংসদ ব্যস্ত বিধায় সাক্ষাৎ হয় নি। (পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই সাংসদ কোন দলের? আওয়ামী লীগ না-কি বিএনপি? তাঁদের আশ্বস্ত করছি, যে দলেরই হোক জিনিস একই। গুণগত মানের কোনো উনিশ-বিশ নেই। আওয়ামী ভাবধারার পাঠকরা ধরে নিন সাংসদ বিএনপি'র। বিএনপি ভাবধারার পাঠকরা ধরে নিন সাংসদ আওয়ামী লীগের।)

রাত আটটা। ইয়াকুবের জ্বর আরো বেড়েছে। মর্জিনা তার মাথায় পানি ঢালছে। এলাকায় কোনো ডাক্তার নেই, একমাত্র ভরসা হুজুরের পানিপড়া এবং প্যারাসিটামল ট্যাবলেট। ইয়াকুবকে প্যারাসিটামল ট্যাবলেটও খাওয়ানো যায় নি। কারণ দোকান বন্ধ।

শুভ্র তার ঘরে। চৌকিতে উপুড় হয়ে বসে সে চিঠি লিখছে। তার সামনে দু'টা হারিকেন। একটা হারিকেনের আলোয় তার দেখতে সমস্যা হয়। পাশের ঘরে ইয়াকুব কাতরাচ্ছে, তাতে তার চিঠি লেখায় অসুবিধা হচ্ছে না।

মা,

তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি, কিন্তু এই চিঠি পাঠাতে পারব না। যেখান থেকে লিখছি সেখানে পোস্টঅফিস নেই। সেটা সমস্যা না। নৌকায় করে মুন্সিগঞ্জ সদর পোস্টঅফিসে

যাওয়া যায়। সমস্যাটা হচ্ছে, আমি তো তোমাদের বাড়ির ঠিকানা জানি না। ঠিকানা জানার প্রয়োজন কখনো হয় নি। বিশাল এসি গাড়িতে সারা জীবন ঘোরাঘুরি করেছি।

মা! আমি আনন্দে আছি। অন্য ধরনের আনন্দ। কী রকম বুঝিয়ে বলি।

মনে করো প্রচণ্ড গরম পড়েছে। লু হাওয়ার মতো বইছে। ধুলি উড়ছে। গা দিয়ে স্রোতের মতো ঘাম বের হচ্ছে। শরীর জ্বলে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ একসময় আকাশের এককোণে কালো মেঘ দেখা গেল। সবার মধ্যে সে কী উত্তেজনা! আসছে, বৃষ্টি আসছে। যখন বৃষ্টি নামে কী যে শান্তি! প্রথমদিনের বৃষ্টির আনন্দে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। চরের ছেলেমেয়েরা (বলতে ভুলে গেছি, আমি চরে বাস করি) একসময় কাদায় গড়াগড়ি করা শুরু করল। আমিও তাই করলাম। গাভর্তি কাদা নিয়ে নদীতে মহিষের মতো শরীর ডুবিয়ে বসে রইলাম। কী শান্তি! কী শান্তি!

মা! তুমি কি উইলিয়াম গোল্ডিংয়ের *Lord of the Flies* উপন্যাসটা পড়েছ ? মনে হয় পড় নি। বাবা পড়েছেন। একদল শিশু নির্জন দ্বীপে উপস্থিত হয়। একে একে তাদের চরিত্র প্রকাশিত হতে থাকে। আমি খুব কাছ থেকে গোল্ডিং সাহেবের উপন্যাস দেখছি। ফিজিক্সে ল্যাবরেটরি আছে। সাহিত্যে কোনো ল্যাবরেটরি নেই। এই প্রথম আমি সাহিত্যের ল্যাবরেটরি দেখছি এবং মজা পাচ্ছি।

মানুষের চরিত্রের অন্ধকার সবসময় প্রকাশিত হয় না। হঠাৎ হঠাৎ প্রকাশিত হয়। তার জন্যে বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজন হয়। চর হচ্ছে সেই পরিস্থিতি। আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি একটা Virtual জগতে ঢুকে গেছি। কিছুই না জেনে আমি এই জগতের একজন observer।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় observer অতি গুরুত্বপূর্ণ। রিয়েলিটি অবজার্ভারনির্ভর। আমি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

অনেক জটিল জটিল কথা লিখে ফেললাম। এখন হালকা কথা। আমাদের দ্বীপের মানুষের খুব মন খারাপ। কেন জানো ?

কারণ দ্বীপে কোনো পাগল নেই। একজন উন্মাদ না-কি তার হতভাগ্যের কারণে অন্যের ভাগ্য নিয়ে আসে। আমরা সবাই একজন পাগলের জন্যে অপেক্ষা করছি। বাইরে থেকে পাগল আনলেও চলে, তবে নিজেদের পাগল থাকলে সবচেয়ে ভালো হয়।

মা! এখন গানবাজনার আসর বসেছে। যে গান করছে তার নাম কল্লাকাটা। এই অদ্ভুত নামের কারণ হচ্ছে সে কথায় কথায় মানুষের কল্লা কেটে ফেলতে চায়। কল্লাকাটার গলা সুন্দর। শুনেছি আগে অনেক সুন্দর ছিল। প্রচুর গাঁজা খাবার কারণে গলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কল্লাকাটা শুধু যে গান করে তা না, সে আবার গীতিকারও। নিজেই গান লিখে, নিজেই সুর দেয়। আমাকে নিয়ে সে বেশ কয়েকটা গান লিখেছে। তার একটার কথা এরকম—

ধলা মিয়া করবে বিয়া
নয়া পাড়ায় গিয়া
ঘাট থাইকা কইন্যা তুললাম
মুন্সিগঞ্জে গিয়া।
মুন্সিগঞ্জের কইন্যা সুন্দর
সুন্দর তাহার আঁখি
তারে দেখলে মন উদাস
যেন কোকিল পাখি।
ধলা মিয়া বড়ই ধলা
কন্যা হইলেন কালো
ধলা-কালা মিলনেতে
জগৎ হইবে আলো...

বিশাল গান। পুরোটা মনে নেই। ধলা মিয়া আমার নাম। সবাই আমাকে ধলা মিয়া ডাকে। কেউ কেউ ডাকে মাথাছিলা ধলা মিয়া। মাথা কামিয়েছি তো—এইজন্যে।

মা, তোমাকে চিঠিটা পাঠানোর বুদ্ধি বের করেছি। তোমার বাড়ির ঠিকানা ভুলে গেলেও যুথীর ঠিকানা মনে আছে। এবং খাতায় লেখাও আছে।

মা, আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। আমি একটা experiment শুরু করেছি। তার ফলাফল দেখতে চাই।

কয়েকদিন আগে স্বপ্নে দেখলাম M.Sc. পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে। আমি থার্ড ক্লাস পেয়েছি।

চেয়ারম্যান স্যারের কাছে জানতে চাইলাম, রেজাল্ট এত খারাপ হলো কেন ? চেয়ারম্যান স্যার বললেন, শেকসপিয়ার থেকে চারটা প্রশ্ন এসেছিল। তুমি সবকটা ভুল আনসার করেছ।

আমি বললাম, স্যার, আমি তো ফিজিক্সের ছাত্র।

চেয়ারম্যান স্যার বললেন, তুমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, যাও পাগলাগারদে ভর্তি হয়ে যাও।

স্যারের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন বদলে গেল। আমি দেখলাম, আমি একটা পাগলাগারদে বসে আছি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন পাগল আছে। এবং এদের সঙ্গে আমার অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আমি এই পাগলদের একজনকে ভুলিয়ে ভালিয়ে চরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। ভয়ঙ্করটাইপ একজন মোটামুটি রাজি হয়েছে।

মা, ঘুম পাচ্ছে। আবার ক্ষিধেও লেগেছে। আমি এখন খিচুড়ি রান্না করব। কারণ মর্জিনা তার বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত। তার বাবার শরীর খুবই খারাপ করেছে। যেভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আজ রাতেই মারা যায় কি না কে জানে।

ইতি

তোমার শুভ্র

পুনশ্চ-১ : মর্জিনার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। চিৎকার করে কাঁদছে। মনে হয় তার বাবা মারা গেছেন। আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।

পুনশ্চ-২ : না, এখনো বেঁচে আছেন। মাঝখানে অজ্ঞানের মতো হয়ে গিয়েছিলেন বলে ভয় পেয়ে মর্জিনা কাঁদছিল।

চিঠি শেষ করে শুভ্র খিচুড়ি বসাল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হালকা বাতাস দিচ্ছে। বাতাস আরেকটু বাড়লে উঠানের চুলা নিভিয়ে ঘরে চলে যেতে হবে।

মর্জিনা এসে পাশে বসল। শুভ্র বলল, তোমার বাবার অবস্থা কী?

মর্জিনা হাই তুলতে তুলতে বলল, বাঁচব না।

শুভ্র বলল, সামান্য জ্বরে মানুষ মারা যায়?

মর্জিনা বলল, জ্বরে কেউ মরে না। মৃত্যুরোগে মরণ হয়। ঘরের ভিতরে আজরাইল ঢুইক্যা পড়ছে।

শুভ্র বলল, কী বলো এইসব?

হামাগুড়ি দিয়া ঢুকছে। পরিষ্কার দেখছি। বাপজানের দিকে চাইয়া হাসছে। তারপরে চৌকির নিচে ঢইলা গেছে। এখন সে অপেক্ষায় আছে।

শুভ্র বলল, তোমার মাথা সামান্য খারাপ আছে মর্জিনা।

মর্জিনা বলল, আপনের সঙ্গে যে ভাইবোন পাতাইছি, বাপজানের মৃত্যুর পর সব শেষ। তখন আপনে আমার আর ভাই না।

আমি কে?

আপনি পুরুষমানুষ। মূর্চ্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। আর কিছু না।

এর মানে কী?

এর মানে আপনে জানলে জানেন, না জানলে নাই। খিচুড়ি নামান, খিদা লাগছে।

মাত্র বসিয়েছি, এখনো চাল ফুটে নাই।

ভাইজান, একটা গল্প করেন। গল্প শুনি।

কী গল্প শুনতে চাও?

পীরিতের গল্প। ভাব-ভালোবাসার গল্প।

ভাব-ভালোবাসার গল্প তো সেইভাবে আমি জানি না।

আপনে কোনোদিন ভাব-ভালোবাসা করেন নাই?

না।

মর্জিনা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, যে-কোনো একটা গল্প বলেন।

ভারচুয়াল রিয়েলিটির গল্প শুনবে?

সেইটা আবার কী?

শুভ্র বলল, বিষয়টা যথেষ্টই জটিল, আমি চেষ্টা করব সহজভাবে বোঝাতে। আমার ধারণা তুমি মন দিয়ে শুনলেই বুঝবে। কারণ তুমি অতি বুদ্ধিমতী একজন মেয়ে।

শুভ্র গল্প শুরু করেছে। মর্জিনা মন দিয়েই শুনছে, তবে তার দৃষ্টি শুভ্রর দিকে না। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বিজলি চমকাচ্ছে, সে তাই দেখছে। বিদ্যুৎচমকের সময় আকাশে নানান নকশা তৈরি হয়। এইসব নকশায় অনেক ইশারা থাকে। ইশারায় আল্লাহপাক অনেক কিছু বলেন। 'আক্কেলমন্দ' মানুষরা সেটা ধরতে পারে।

শুভ্র বলছে, প্রথমেই একটা বিষয় বুঝতে হবে—তা হলো বাস্তবতা, ইংরেজিতে যাকে বলে Reality। আমি উঠানে বসে খিচুড়ি রান্না করছি। তুমি সামনে বসে আছ। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তোমার এবং আমার কাছে এটা রিয়েলিটি। তুমি যদি আগুনে হাত দাও, হাত পুড়ে যাবে। এটাও রিয়েলিটির অংশ। আবার তুমি যখন স্বপ্ন দেখ, সেটাও রিয়েলিটি। স্বপ্নে আগুনে হাত দিলে ব্যথার অনুভূতি হবে।

এখন কথা হচ্ছে, দু'টি রিয়েলিটির কোনটি সত্য? না-কি এই দুই রিয়েলিটির বাইরে কিছু আছে? আমরা বড় কোনো রিয়েলিটির অংশ? এমন কি হতে পারে যে, আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রাম ছাড়া কিছুই না? একজন মাস্টার প্রোগ্রামার আমাদের তৈরি করেছেন। আমাদের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ দিচ্ছেন। আমরা বিষয়টি বাস্তব ভেবে আনন্দ পাচ্ছি। আসলে পুরোটাই একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামার আমাদের জন্যে ভারচুয়াল রিয়েলিটি তৈরি করেছেন।

মর্জিনা বলল, বকবকানি বন্ধ করেন তো ভাইজান। ভাত সিদ্ধ হইছে কি না দেখেন। হওয়ার কথা।

মর্জিনা উঠে গেল। দু'টা প্লেট নিয়ে এল। ঘিয়ের কৌটা আনল। চায়ের চামচে দু'চামচ ঘি খিচুড়িতে ছেড়ে দিয়ে প্লেট ধুতে বসল।

তারা খাওয়া শুরু করামাত্র বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। মর্জিনা বলল, যেখানে বইসা আছেন বইসা থাকেন। খাওয়ার মাঝখানে জায়গা বদল করতে নাই। জায়গা বদল করলে রিজিক কমে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে খাব?

হুঁ।

তোমার সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা।

মর্জিনা বলল, আপনার নিজের কথাও অদ্ভুত। অদ্ভুতে অদ্ভুতে কাটাকাটি।

ভালো বৃষ্টি শুরু হয়েছে। থালার ওপর বৃষ্টির পানি পড়ছে। মর্জিনা নির্বিকার। সে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে হা করে বৃষ্টির পানিও খাচ্ছে। শুভ্র খাওয়া বন্ধ করে মর্জিনার কাণ্ড দেখছে।

ঘরের ভেতর থেকে ইয়াকুবের গলা শোনা গেল। ভীত গলা।

ও মর্জিনা! মর্জিনা কই ? মর্জিনা!

মর্জিনা বলল, আমি উঠানে ভাত খাই।

ইয়াকুব বলল, তুফানে তো বাড়িঘর উড়ায়া নিয়া যাইতেছে।

মর্জিনা বলল, তুফানের বংশও নাই। বৃষ্টি পড়তাছে। চুপ কইরা শুইয়া থাকেন, আসতেছি।

এক্ষণ আয়।

খাওয়া শেষ কইরা আসব।

বাড়িঘর সব তো উড়ায়া নিয়া যাইতেছে। শেষে ঘরচাপা পইড়া মরব। তাড়াতাড়ি আয়, চৌকির নিচে বইসা থাকি।

মর্জিনা বলল, আপনের ইচ্ছা করলে আপনে চৌকির নিচে বসেন।

মর্জিনার কথা শেষ হবার আগেই খুব কাছে কোথাও বজ্রপাত হলো। কঠিন নীল আলোয় মর্জিনার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মর্জিনা বলল, কী ভয়ঙ্কর!

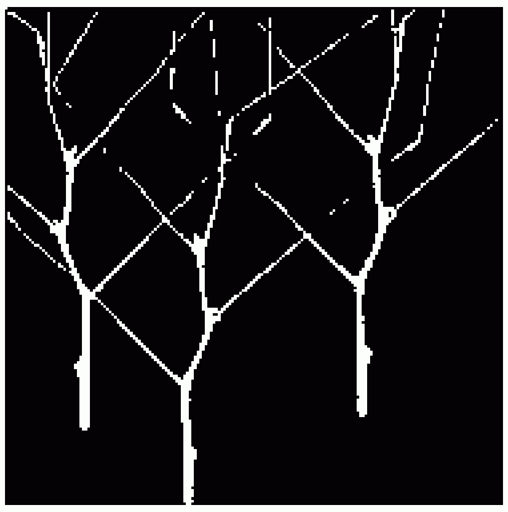
শুভ্র বলল, বিজলির এক ঝলকানিতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ থাকে তুমি জানতে চাও ?

মর্জিনা বলল, না।

সে খাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকে দেখে, ইয়াকুব চৌকির নিচে। তার বসার ভঙ্গি হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের মতো। শুধু মুখ হা হয়ে আছে। তার শরীরে প্রাণ নেই।

মর্জিনা বলল, বাবা, চৌকির নিচ থাইকা বাইর হন।

কোনো উত্তর এল না। মৃত মানুষরা জীবিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে না। তাদের আলাদা সমাজ।



অনেকদিন পর যূথী এসেছে নীপাদের বাড়িতে। নীপা তাকে সরাসরি শোবার ঘরে ডাকল। নীপার ঘুম পুরোপুরি কাটে নি। সে বাসিমুখে এককাপ ব্ল্যাক কফি খেয়েছে। এখন খাচ্ছে গ্রীন টি। এতেও ঘুম যাচ্ছে না। নীপার গায়ে পাতলা চাদর। চাদরের ভেতর দিয়ে তার নগ্ন শরীর দেখা যাচ্ছে।

নীপা বলল, কাল রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে ছিলাম। ভূতের ছবি দেখেছি। বাতি জ্বালিয়ে আমি ঘুমুতে পারি না। ভয়ে নিভাতেও পারি না। ঘুম এসেছে ভোর পাঁচটায়। এই কারণে এখন পর্যন্ত ঘুমাচ্ছি। যূথী, কয়টা বাজে?

এগারোটা দশ।

চা খাবি?

না।

নীপা বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, অনেকদিন একা ঘুমাই না। কাল একা ঘুমিয়েছি বলে ঘুমও ভালো হয় নি।

নীপার গা থেকে চাদর সরে গেছে। তাতে সে মোটেই বিব্রত বোধ করছে না। এতদিন পর যূথীর সঙ্গে দেখা—এই নিয়েও তার কোনো মাথাব্যথা নেই। যূথী বলল, একা ঘুমাচ্ছিস না মানে কী? কে তোর সঙ্গে ঘুমুচ্ছে?

নীপা হাই তুলতে তুলতে বলল, লাইলি। তোর ভাইয়ের বৌ। অসাধারণ একটা মেয়ে। অসাধারণ টু দা পাওয়ার ফাইভ।

যূথী বলল, সে কোথায়?

নেপালে। কাঠমুণ্ডুতে। করিম আঙ্কেলের সঙ্গে গেছে। করিম আঙ্কেলের ছবির স্ক্রিপ্ট পড়া হবে। সেই উপলক্ষে যাওয়া। আমারও যাওয়ার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে যেতে ইচ্ছা করল না। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি। বাথরুমের দরজা খোলা। কথাবার্তা চালাতে সমস্যা নেই।

যূথী বলল, তুই কি বস্ত্র পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছিস?

নীপা বাথরুম থেকে বলল, মোটামুটি সেরকমই। মনে হয় কাপড়ে এলার্জি হচ্ছে। কাপড় গায়ে লাগলেই হালকা র‍্যাশের মতো হয়।

লাইলিরও কি এই অবস্থা ?

নীপা হাসতে হাসতে বলল, হুঁ।

আমার ভাইয়ের স্ত্রীর তাহলে অনেক উন্নতি হয়েছে!

নীপা বলল, পুরো বিষয়টা দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করছে। প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের দৃষ্টিতে চরম অবনতি। আবার করিম আঙ্কেলের দৃষ্টিতে উন্নতি।

যুথী বলল, সে কি মদটদও খাচ্ছে ?

শুধু টাকিলা খাচ্ছে। অন্যকিছু না। দুপুরে নিয়ম করে বিয়ার খাচ্ছে। বিয়ারকে মদ বলা ঠিক না।

ড্রাগস ?

ড্রাগসের মধ্যে ইয়াবা। সবসময় না। যখন পার্টি থাকে তখন।

নীপা বলল, আমি এখন উঠব। লাইলিকে একটা বিশেষ খবর দিতে এসেছিলাম। সে যখন নেই, তোকে দিয়ে যাচ্ছি। আমার ভাই মারা গেছে।

Oh God! কবে ?

কবে জানি না। লাইলি এখন যা ইচ্ছা করতে পারে। আমাদের দিক থেকে কোনো বাধা নেই।

নীপা বাথরুম থেকে বের হলো। এখন তার গায়ে টাওয়েল জড়ানো। সে যুথীর সামনে বসতে বসতে বলল, Every cloud has a silver lining. আমার ধারণা, লাইলি তার হাসবেন্ডের মৃত্যুর খবর শুনে তেমন দুঃখিত হবে না। তবে সামাজিক নর্ম বজায় রাখার জন্যে দুঃখিত হবার ভান করবে।

যুথী বলল, উঠি ?

নীপা বলল, উঠি মানে! দুপুরে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবি, তারপর যাবি। আরেকটা কাজ করবি—নেপাল যাবি ? সন্ধ্যায় ড্রুক এয়ারের একটা ফ্লাইট আছে। চল কাঠমুণ্ডু চলে যাই। ভিসার ঝামেলা নাই। নেপালের ভিসা অন এরাইভেল। তোর পাসপোর্ট আছে না ?

না।

নীপা বলল, কোনো বিষয়ই না। তিন ঘণ্টার মধ্যে পাসপোর্ট করিয়ে দিচ্ছি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে। আমি ভিডিও ক্যামেরা সেট করে রাখব, তুই লাইলিকে তার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ দিবি। তার রিঅ্যাকশান অন রেকর্ড থেকে যাবে। রাজি ?

যুথী বলল, না। আমি এখন উঠব।

লাঞ্চও করবি না ?

না।

আমার সঙ্গে লাঞ্চ করলে মজার একটা গল্প বলতাম। গল্পটা আগে মজার ছিল না। তোর ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর গল্পটা মজার হয়েছে।

যুথী বলল, মজার গল্প শুনব না।

নীপা বলল, শুনতেই হবে। লাঞ্চ খেতে রাজি না হলেও শুনতে হবে। এই গল্প না শুনে তুই যেতে পারবি না। করিম আঙ্কেল লাইলিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। পুরোটাই ফান। তবে এখন তো আর ফান হবে না। করিম আঙ্কেল বলেছেন, লাইলি, তুমি যে দিন যে সময়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে, আমি বিয়ে করব। পুরুষ হিসেবে এটা আমার Promise. এই বলে তিনি একটা নোংরা কাজ করলেন। তখন আমরা নেশার ঘোরে ছিলাম বলে নোংরামি ধরা পড়ে নি। নোংরা কাজটা কী শুনবি ?

না।

তারপরেও শুনতে হবে। নোংরা কাজটা হচ্ছে তিনি বললেন, প্রাচীন গ্রীসে পুরুষরা কঠিন প্রতিজ্ঞা করত তাদের Testicles চেপে ধরে। সেখান থেকে ইংরেজি শব্দ Testimony এসেছে। এখন আমিও নিজের Testicles চেপে ধরে প্রতিজ্ঞা করছি, লাইলি আমাকে যেদিন বিয়ে করতে চাইবে আমি সেদিনই বিয়ে করব।

যুথী উঠে পড়ল। নগ্ন নীপার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। গায়ে জড়ানো টাওয়েল নীপা বিছানায় ছুড়ে ফেলেছে। এর মধ্যে কাজের মেয়ে এসে চায়ের কাপ নিয়ে গেছে। নীপার মধ্যে কোনো অস্বস্তি নেই। নীপা আগে এরকম ছিল না। মানুষ যখন বদলাতে শুরু করে তখন দ্রুত বদলায়।

করিম আঙ্কেল ছয়জনের একটা দল নিয়ে নেপালের এভারেস্ট হোটেলে আছেন। এই দলে ক্যামেরাম্যান আছে, মিউজিক ডাইরেক্টর আছে, শিল্পনির্দেশক আছে। তিনজন মেয়ের টিকিট কাটা হয়েছিল, শেষ মুহূর্তে নীপা না আসায় এখন আছে লাইলি এবং যমুনা।

স্ক্রিপ্ট পড়া এখনো শুরু হয় নি। করিম আঙ্কেল নীপাকে sms করে জানিয়েছেন, সে না আসা পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট পড়া হবে না। নীপা জানিয়েছে সে

আসছে। এখন দল বেঁধে কাঠমুন্ডু দর্শন চলছে। নগরকোটে সূর্যাস্ত দেখা, হনুমানজির মন্দির দেখা—এইসব। সন্ধ্যার পর ক্যাসিনোতে জুয়া খেলা। করিম আঙ্কেল লাইলিকে পাঁচ হাজার ইন্ডিয়ান টাকা দিয়েছেন জুয়া খেলার জন্যে। তিনি মিনি-ফ্ল্যাস নামের একটা খেলা লাইলিকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রথম যারা জুয়া খেলে তাদের 'বিগিনার্স লাক' বলে একধরনের লাক থাকে। আজ তুমি অবশ্যই জিতবে। গুড লাক। আমি যাচ্ছি ফ্ল্যাস খেলতে। আসল জুয়া হচ্ছে ফ্ল্যাস। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই গ্রহে যত ক্রিয়েটিভ লোক জন্মেছেন, সবাই ছিলেন ফ্ল্যাস জুয়ায় আসক্ত। উদাহরণ—

দস্তয়োভসকি
দা ভিঞ্চি
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
পাবলো পিকাসো

রবীন্দ্রনাথ ফ্ল্যাস খেলতেন না বলে তাঁর সাহিত্যে খানিকটা 'কবুতরের বাকবাকুম' ঢুকে গেছে। কেউ তাঁকে ফ্ল্যাস ধরিয়ে দিলে বাংলা সাহিত্য আরো অনেকদূর যেত। আফসোস!

করিম আঙ্কেল রাত বারোটায় লাইলি কী করছে খোঁজ নিতে এসে দেখেন, সে কুড়ি হাজার টাকা জিতে জম্বি অবস্থায় চলে গেছে। তার হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। অদ্ভুত চোখ করে তাকাচ্ছে।

করিম আঙ্কেল বললেন, যথেষ্ট জিতেছ। আর খেলতে হবে না। চলো আমার সঙ্গে।

লাইলি বলল, আরও কিছুক্ষণ খেলি। প্লিজ।

করিম আঙ্কেল বললেন, না। আজকের মতো যথেষ্ট। এখন তুমি হারতে শুরু করবে। তাই নিয়ম। তুমি হুইস্কি খেয়েছ না-কি ? মুখ থেকে গন্ধ বের হচ্ছে।

যখন জিতছিলাম তখন ওরা ফ্রি হুইস্কি খাওয়াচ্ছিল। তাই খেয়েছি।

কয় পেগ খেয়েছ মনে আছে ?

না।

করিম আঙ্কেল লাইলির কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে ক্যাসিনো থেকে বের করলেন। বিষয়টা কারও কাছেই অস্বাভাবিক মনে হলো না। লাইলির কাছেও না। ক্যাসিনো থেকে বের হয়েই লাইলি হঠাৎ হড়বড় করে করিম আঙ্কেলের গায়ে বমি করে নেতিয়ে পড়ল। করিম আঙ্কেল বললেন, নো প্রবলেম। করিম আঙ্কেল মানুষটা এত ভালো কেন—এই ভেবে লাইলির চোখ ভিজে উঠল।

করিম আঙ্কেল লাইলিকে নিজের হাতে গোসল করিয়ে দিলেন। টাওয়েল দিয়ে শরীর মুছে বিছানায় শুইয়ে দিতে দিতে বললেন, আরাম করে একটা ঘুম দাও। সকালে দেখবে শরীর-মন দুই-ই ফ্রেশ। তখন জেতার টাকা নিয়ে বের হয়ে একসেট গয়না কিনে ফেলো। তা না করলে জেতা টাকা জুয়াতেই চলে যাবে।

লাইলি বিড়বিড় করে বলল, আপনি কি চলে যাচ্ছেন ?

করিম আঙ্কেল বললেন, হ্যাঁ। আমার দায়িত্ব শেষ।

লাইলি বলল, আপনি যাবেন না। আপনি চলে গেলে আমার ভয় লাগবে। আমি একা ঘুমাতে পারি না।

তাহলে অবশ্যই থাকব। তোমাকে পাহারা দেব। ভালো কথা, তোমাকে একটা খবর দেওয়া হয় নি। নীপা জানিয়েছে তোমার হাসবেন্ড টুনু মারা গেছে।

লাইলি কী যেন বলল, পরিষ্কার বোঝা গেল না।

করিম আঙ্কেল লাইলির পিঠে হাত রেখে বললেন, তুমি ঘোরের মধ্যে আছ বলেই খবরটা এখন দিলাম। মৃত্যুকে সহজভাবে নিতে হবে লাইলি। মৃত্যু হলো জীবনেরই অংশ। বুঝতে পারছ ?

হুঁ।

মৃত্যু আছে বলেই জীবনকে আমরা তিলেতিলে অনুভব করব। জীবন কী ? জীবন হলো একগ্লাস শ্যাম্পেন। আমরা বেঁচে আছি মানে আমরা শ্যাম্পেন খাচ্ছি। যখন তলানিতে এসে যাব তখনই মৃত্যু। মৃত্যু থাকার কারণেই শ্যাম্পেন পানের প্রতিটি মুহূর্তকে আনন্দময় করে রাখতে হবে। হবে না ?

হুঁ।

মনে রাখতে হবে, এ জগতে আনন্দই সত্য, আর সব মিথ্যা। আমার সঙ্গে বলো, আনন্দই সত্য আর সব মিথ্যা।

লায়লী বিড়বিড় করে বলল, আনন্দই সত্য, আর সব মিথ্যা।

করিম আঙ্কেল বললেন, তোমার মন ঠিক করার জন্যে এখন অন্য প্রসঙ্গে আলাপ করি। করব ?

হুঁ।

করিম আঙ্কেল বললেন, প্রতিটি নারীর শরীরে বিশেষ একধরনের গন্ধ আছে। কারও গায়ে থাকে পদ্মের গন্ধ। তাদেরকে বলে পদ্ম নারী। কারও গায়ে থাকে বাসি বকুল ফুলের গন্ধ। এরা হলো বকুলগন্ধা। একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তার গায়ে ধুতরা ফুলের গন্ধ। ভয়ঙ্কর অবস্থা! এখন তুমি কি জানতে চাও তোমার গায়ে কিসের গন্ধ ?

জানতে চাই। আমার গা শুঁকে বলে দিন।

করিম আঙ্কেল বললেন, ব্যাপারটা এত সহজ না। আগামী সাতদিন তুমি গোসল করবে সাবান ছাড়া। চুলে শ্যাম্পু দেবে না। গায়ে কোনো সেন্ট বা লোশন ব্যবহার করবে না। তখনই তোমার গায়ের আসল গন্ধ ফুটে বের হবে। এবং আমি বলে দেব। আমার নাক কুকুরের নাকের চেয়েও শার্প। এখন ঘুমিয়ে পড়ো।

লাইলি ঘুমিয়ে পড়ল।

যুথী মেরাজউদ্দিন সাহেবের অফিসে এসেছে। বিশাল অফিস। অনেক লোকজন কাজ করছে। সেই তুলনায় মেরাজউদ্দিন সাহেবের অফিসঘর ছোট। তাঁর সামনে একটি মাত্র চেয়ার। একজন ছাড়া দ্বিতীয় দর্শনার্থীকে তিনি সম্ভবত সাক্ষাৎ দেন না। ঘরে দেখার মতো জিনিস একটাই। প্রকাণ্ড একটা ঘড়ি। ঘড়ির সেকেন্ডের শব্দটাও শোনা যাচ্ছে। ঘড়ির নিচে লেখা—

You can stop time
If you really want to stop.

যুথীর কাছে লেখার অর্থটা পরিষ্কার হচ্ছে না। —তুমি চাইলেই সময় আটকাতে পার, যদি তা সত্যিকার অর্থেই চাও।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তোমার নাম যুথী?

যুথী বলল, জি।

তোমাকে তো আমি আসতে বলি নি। তুমি কি কোনো বিশেষ কারণে এসেছ?

যুথী বলল, আপনারা কি শুভ্রর খোঁজ পেয়েছেন?

না।

সে তার মা'কে একটা চিঠি লিখেছে। চিঠিটা পাঠিয়েছে আমার ঠিকানায়। আমি চিঠিটা নিয়ে এসেছি।

চিঠিতে সে কোথায় থাকে তা কি লেখা আছে? কোনো ঠিকানা কি দিয়েছে?

না। তবে আমি ঠিকানা বের করে ফেলেছি।

কীভাবে বের করলে?

খামে মুন্সিগঞ্জ পোস্টাপিসের ছাপ আছে। শুভ্র লিখেছে সে থাকে এক বিশাল চরে। আমার ধারণা মুন্সিগঞ্জের আশেপাশে পদ্মায় যেসব নতুন চর জেগেছে, সেখানে খোঁজ করলেই তাকে পাওয়া যাবে।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তুমি স্মার্ট মেয়ে, তবে শুভ্র যে চিঠি তার মা'কে লিখেছে সেই চিঠি তুমি পড়লে কেন?

যুথী বলল, চিঠির সঙ্গে আমাকে লেখা একটা চিরকুট ছিল। সেখানে লেখা আমি যেন তার মা'র চিঠিটা পড়ি। স্যার, আমি কি চিঠিটা আপনাকে দেব ?

দাও।

মেরাজউদ্দিন সাহেবের সামনে চিঠি রেখে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যুথী বলল, স্যার আমি উঠি ?

না। তুমি বসবে এবং আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করব। এটা আমার অর্ডার।

যুথী বলল, আপনার অর্ডার মানতে বাধ্য এমন কেউ তো আমি না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, অবশ্যই তুমি আমার অর্ডার মানতে বাধ্য। পুলিশ যখন তোমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল, তখন আমি তোমাকে উদ্ধার করি। নয়তো রিমান্ডের ঝামেলায় পড়তে। তোমার সবকিছু আমি জানি। আমি স্পাই লাগিয়ে রেখেছিলাম।

কেন ?

আমার ছেলের জন্যে। ভালো কথা, শুনলাম তোমার ভাই তোমার অ্যাকাউন্টে যে টাকা রেখেছে তুমি তা নিতে অস্বীকার করেছ। তার কেনা ফ্ল্যাটেও উঠছ না।

যুথী বলল, আপনি কীভাবে জানেন ?

মেরাজউদ্দিন বললেন, ইনফরমেশন গেদার করার আমার অনেক মেকানিজম আছে। দুপুরে কী খাবে বলো। এমন কিছু বলো যা জোগাড় করতে আমার কষ্ট হবে এবং হয়তো জোগাড় করতে পারব না। আমি কতটুক পারি তারও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে।

যুথী বলল, মানুষকে আপনি আপনার ক্ষমতা দেখিয়ে চমকে দিতে ভালোবাসেন, তাই না ?

হয়তোবা।

আপনার ছেলে কিন্তু আপনার মতো হয় নি। সে গিনি সোনা হয়েছে।

গিনি সোনাটা কী ?

বাইশ ভাগ শোনা দুই ভাগ তামা।

তার তামার অংশ কোনটা ?

যুথী বলল, তার বোকামিটা।

এখনো তো বললে না তুমি কী খাবে ? কী খেতে ইচ্ছা করছে ?

যুথী বলল, আপনার এখানে আমার কোনো কিছুই খেতে ইচ্ছা করছে না।

কারণ কী ?

যুথী বলল, আমি দীর্ঘ সময় আপনার সঙ্গে আছি। আমি আপনার জন্যে একটি আনন্দসংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি আপনার মেয়ের বয়েসী, অথচ একবারও আপনার মুখ থেকে 'মা' শব্দটি বের হলো না। এই বিস্ময়ের কারণেই খেতে ইচ্ছা করছে না।

যুথী উঠে দাঁড়াল।

মেরাজউদ্দিন বললেন, বোস। বোস বললাম।

যুথী বলল, কী আশ্চর্য, আমাকে ধমকাচ্ছেন কেন ?

মেরাজউদ্দিন বললেন, মেয়েকে ধমকানো যায়। তোমাকে মেয়ে হিসাবে গ্রহণ করলাম। You are my daughter that I never had. মা, বলো কী খাবে ?

যুথী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, পোলাওয়ের চালের ভাত, টাটকা পুঁটি মাছ ভাজা, সরিষা দিয়ে সজিনা, কৈ মাছের ঝোল, মুগ ডাল।

মেরাজউদ্দিন কিছুটা বিস্ময় এবং কিছুটা আনন্দ নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন। সহজ স্বাভাবিক একটা মেয়ে। প্রায় বিশেষত্বহীন। তবে এই মেয়ে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে। পরিবেশের সঙ্গে রঙ বদলানোর ক্ষমতা এর অবশ্যই আছে।

যুথী বলল, আপনার ঘড়ির নিচের লেখাটার অর্থ বুঝতে পারছি না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, লেখাটার অর্থ একেকজন একেকভাবে করে। তুমি নিজে একটা অর্থ বের করো।

যুথী বলল, মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে। আত্মহত্যার অর্থ তার কাছে সময় আটকে যাওয়া।

মেরাজউদ্দিন বললেন, মানুষকে আত্মহত্যায় উৎসাহ দেয় এমন একটা লেখা আমি কেন ঘরে সাজিয়ে রাখব ? চিন্তা করে আসল অর্থটা বের করো। যেদিন বের করবে সেদিন তোমাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হবে।

মেরাজউদ্দিন সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে বাড়ি ফিরেন। বারান্দায় বসে স্ত্রীর সঙ্গে এককাপ চা খান। এই অভ্যাস তাঁর অনেকদিনের। চায়ের এই আসরে শুভ্রকে কখনো ডাকা হয় না। মেরাজউদ্দিন মনে করেন চা পানের এই উৎসব শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী দু'জনের।

আজ তিনি ঠিক সময়ে ফিরেছেন, কিন্তু চায়ের আসরে বসতে পারেন নি। রেহানার কাছে একজন পীর সাহেব এসেছেন। তিনি নখে তিল তেল দিয়ে কী সব

মন্ত্র (বা দোয়াদুরুদ) পাঠ করেন। তখন নখে হারানো ব্যক্তির ছবি ফুটে ওঠে। সে কোথায় আছে কী করছে সবই জানা যায়।

পীর সাহেবের নাম কাশেম কুতুবি। বয়স পঞ্চাশের মতো। মাথার চুল এবং দাড়ি মেন্দি দিয়ে লাল করা। মেন্দি মনে হয় বেশ ভালো জাতের। চুল-দাড়ির লাল রঙ চকচক করছে। তাঁর চোখে ভারী চশমা। গায়ের লেবাস গেরুয়া। পায়ে জুতা বা স্যান্ডেল নেই। মোটা কাঁঠাল কাঠের লাল খড়ম।

কাশেম কুতুবি মেরাজউদ্দিনকে দেখে বললেন, স্যার আমার হলো টেলিভিশন সিস্টেম। পর্দা ছোট, মাত্র আধা ইঞ্চি। কালার নাই। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট।

মেরাজউদ্দিন স্ত্রীর পাশে বসলেন। শুভ্র বিষয়ে তাঁর সব দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। এখন আদিভৌতিক কর্মকাণ্ড দেখা যেতে পারে।

কাশেম কুতুবি তাঁর বুড়ো আঙুলের নখের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছেন। যদিও ঘরে এসি চলছে, তারপরেও উনার এক অ্যাসিসটেন্ট হুজুরের মাথায় তালপাখা দিয়ে বাতাস করছে।

কাশেম কুতুবি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনার ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি। সে ঘন জঙ্গলের মধ্যে আছে।

রেহানা আগ্রহ নিয়ে বললেন, সুন্দরবন নাকি পার্বত্য চট্টগ্রাম?

বলা মুশকিল। পর্দা ছোট তো। সব পরিষ্কার দেখা যায় না। তাছাড়া আমার নিজের চোখেও কিছু সমস্যা হয়েছে। ভালো দেখি না। এইজন্যে চশমা খরিদ করতে হয়েছে।

রেহানা বললেন, ছেলে কি দেশের ভেতরে আছে?

কাশেম কুতুবি বললেন, বর্ডার এলাকায় আছে।

মেরাজউদ্দিন বললেন, বর্ডার এলাকায় আছে এটা বুঝলেন কীভাবে?

কুতুবি বললেন, আমি নখে যেমন দেখি কিছু আবার ইশারাতেও পাই। বর্ডারের বিষয়টা ইশারাতে পেয়েছি।

মেরাজউদ্দিন বললেন, ইশারায় আর কী পাচ্ছেন?

ছেলে ঘরে ফিরতে চায় না। একটা মেয়ের সঙ্গে তার ভাব-ভালোবাসা হয়েছে। তার সঙ্গে সে সংসার করতে চায়।

মেরাজউদ্দিন বললেন, ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে মেয়ে পেল কোথায়?

কুতুবি হাসিমুখে বললেন, মেয়েছেলে সব জায়গায় পাওয়া যায় জনাব। ঘন জঙ্গলে পাওয়া যায়, আবার মরুভূমিতেও পাওয়া যায়।

রেহানা বললেন, তুমি সামনে থেকে যাও তো। তোমার কারণে উনি ঠিকমতো দেখতে পারছেন না।

মেরাজউদ্দিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, কুতুবি সাহেব। ভালোমতো দেখুন। আমার ছেলের সন্ধানদাতার জন্যে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পুরস্কারটা নিতে পারেন কি না দেখুন।

মেরাজউদ্দিন বারান্দায় চা খেতে খেতে শুভ্রর চিঠি আরেকবার পড়লেন। বিশেষ কোনো চিঠির পুরো অর্থ ধরতে হলে চিঠিটা তিনবার পড়তে হয়। তিনি দু'বার পড়েছেন। আরও একবার পড়তে হবে।

যুথীর বাবা আজহারের মাথা পুরোপুরিই গেছে। এখন তাঁকে আনন্দিত এবং সুখী মানুষ বলে মনে হয়। নিজের বাড়ির কাউকেই তিনি এখন চেনেন না। চিনলেও অল্প সময়ের জন্যে চেনেন। বাড়ির মানুষদের অতিথি হিসেবে দেখেন এবং যথেষ্ট আদরযত্ন করেন। গতকাল যুথী দুপুরে বাইরে থেকে ফিরেছে, তিনি মেয়েকে দেখে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

মা, যুথী তো এখনো ফিরে নি। একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে সে চলে আসবে। দুপুরে তার বাসায় খাবার অভ্যাস। মা, তোমাকে চা দিতে বলি। চা খেতে খেতে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করো। যুথী চলে এলে তার সঙ্গে ভাত খাবে। দুপুরে কেউ আমার বাড়িতে এসে না খেয়ে যাবে তা হবে না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এলেও একই অবস্থা। তাঁকেও পাটিতে বসে আমাদের সঙ্গে খেতে হবে। একেক বাড়ির একেক সিস্টেম। এটা হলো আমার বাড়ির সিস্টেম। আমাদের বাড়ির আরেকটা সিস্টেম হলো—ইলিশ মাছ নিষিদ্ধ। মহাবীর আলেকজান্ডার ইলিশ মাছ খেয়ে মারা গিয়েছিলেন, জানো নিশ্চয়ই ? উনার মতো মহাবীরের এই অবস্থা হলে আমাদের অবস্থাটা চিন্তা করো। তবে তোমার যদি ইলিশ মাছ খেতে খুব ইচ্ছা করে তাহলে তার ব্যবস্থাও হবে।

আজহার কাউকে চিনতে না পারলেও ডাক্তার আমিরুল ইসলামকে চিনতে পারেন। তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন এমন ভঙ্গিতে গলা নামিয়ে কথা বলেন। কথাগুলি আমিরুল ইসলাম এবং যুথী দু'জনের জন্যেই অস্বস্তিকর। তাঁর মাথায় কী করে যেন ঢুকে গেছে ডাক্তার গোপনে যুথীকে কাজি অফিসে বিয়ে করেছে। ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার নমুনা—

ডাক্তার, তুমি গর্হিত অন্যায় করেছ। বিবাহ একটা সামাজিক ব্যাপার। দশজন আসবে, আমোদ ফুর্তি হবে। বাচ্চারা গেট ধরবে। তোমার জুতা লুকিয়ে

ফেলবে। তুমি কী করলে ? চলে গেলে কাজি অফিসে। ছিঃ ডাক্তার ছিঃ। তোমার কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে আমার তো আপত্তি ছিল না। হীরার টুকরা ছেলে বলতে যা বুঝায় তুমি তা-ই। যাই হোক, যা হবার হয়েছে। এখন মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাও। স্ত্রী থাকবে স্বামীর সঙ্গে। বাবা-মা'র সঙ্গে না। আমি যূথীকে ডেকে বলে দিচ্ছি সে যেন ব্যাগ গুছিয়ে রাখে। আজ তুমি যখন যাবে সেও তোমার সঙ্গে চলে যাবে। আমার সেবাযত্ন নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। টুনুর স্ত্রী যা পারে করবে। বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের সেবা নেওয়া যায় না। তবে ছেলের বৌয়ের সেবা নেওয়া যায়। একটা শাস্ত্রকথা শোনো—

মেয়ে হচ্ছে গলার কাঁটা
জামাই বুকের শেল
পুত্র হলো মাথার ছাতা...

বাকিটা মনে আসছে না। মনে আসলে বলব। এখন তোমরা দু'জন আমার সামনে দাঁড়াও। দু'জনকে একসঙ্গে একটু দেখি। যূথী মা কই ? আয় দেখি।

যূথীর ধারণা তার বাবার এই পাগলামিটা অভিনয়। তিনি পুরোপুরি সুস্থ একজন মানুষ। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে তিনি পাগলামির ভান করে যাচ্ছেন। যূথী এই বিষয়ে তার মা'র সঙ্গে কথা বলেছে। সালমা দুঃখে কেঁদে ফেলেছেন। কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, জন্মদাতা পিতাকে নিয়ে এই ধরনের কথা! ছিঃ ছিঃ! পাগল সেজে তাঁর লাভ কী ?

যূথী বলল, তাঁর সবচেয়ে বড় লাভ তিনি তাঁর মনের কথাগুলি বলে ফেলতে পারছেন। কেউ কিছু মনে করছে না।

তাঁর মনের কথা কী ?

তাঁর মনের কথা হচ্ছে ডাক্তারটার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়া। পাগল সেজে বাবা ওইদিকেই এগুচ্ছেন।

সালমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, জন্মদাতা পিতার সঙ্গে যে মেয়ে এই ধরনের কথা বলে তার সঙ্গে আমি থাকব না। তোর বাবাকে নিয়ে আলাদা বাসা করব।

যূথী বলল, আলাদা বাসা করার তো দরকার নেই। ভাইয়া তোমাদের জন্যে ফ্ল্যাট কিনে রেখেছে। সেখানে গিয়ে ওঠো। বাবা পাগল সেজেছে, তুমি পাগলি সাজো। পাগল-পাগলির সংসার।

সালমা বললেন, যূথী, তুই আর আমার সঙ্গে কথা বলবি না।

যুথী বলল, আচ্ছা যাও বলব না। শেষ কথাটা শুধু বলি। বাবা পাগল সাজার আইডিয়া কোত্থেকে পেয়েছে সেটা শোনো। বাবা আইডিয়া পেয়েছে একটা হিন্দি ছবি থেকে। ছবিটা বাবার সঙ্গে তুমিও দেখেছ। আমি নাম মনে করতে পারছি না। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে।

সালমা বললেন, ওই ছবিতে লোকটা একটা খুন করেছিল। খুনের দায় থেকে বাঁচার জন্যে পাগল সেজেছিল। তোর বাবা কি খুন করেছে ?

বাবা খুন না করলেও তার পুত্র শীর্ষ সন্ত্রাসী টুনু সাহেব করেছেন। ওই বিষয়টা ভুলে থাকার জন্যে পাগল সাজা একটা উত্তম পন্থা।

সালমা গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে যুথীর গালে চড় বসালেন। তিনি কখনোই তাঁর ছেলেমেয়ের গায়ে হাত উঠান নি। এই প্রথম।

নীপা সফিককে নিয়ে করিম আঙ্কেলের স্ক্রিপ্ট শুনতে উপস্থিত হয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় স্ক্রিপ্ট পড়া হবে। হোটেলের একটা হলঘর সেই উপলক্ষে ভাড়া করা হয়েছে। করিম আঙ্কেল কয়েকবার বলেছেন, স্ক্রিপ্ট পড়ার আগে বিশেষ ঘোষণা আছে। সবার জন্যে চমক আছে। চমকটা কী বোঝা যাচ্ছে না।

নীপা লাইলিকে আড়ালে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, করিম আঙ্কেল কি তোমাকে বিয়ে করে ফেলেছে ?

লাইলি বলল, না তো!

তাহলে কিসের চমক ?

লাইলি বলল, আমি জানি না কিসের চমক। উনার কাজকর্ম তো আগে থেকে কিছু বুঝা মুশকিল।

শ্যাম্পেনের বোতল খুলে অনুষ্ঠান শুরু হলো। করিম আঙ্কেল ঘোষণা করলেন, আজ তাঁর জীবনের একটা বিশেষ দিন। আজ স্ক্রিপ্ট পড়া হবে এবং এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে তিনি বিয়ে করবেন। কনের নাম লাইলি। এই মেয়ে জুঁইগন্ধা মেয়ে। তার গায়ে জুঁই ফুলের সৌরভ। বিয়েটা হবে অত্যন্ত দায়সারাভাবে। একজন মাওলানা জোগাড় করা হয়েছে। তার সামনে আমরা কবুল কবুল বলব।

তুমুল হাততালি শুরু হলো। লাইলি লজ্জালজ্জা মুখ করে বসে রইল। আজ সে সাদা একটা লং ফ্রক পরেছে। তাকে দেখাচ্ছে ইন্দ্রাণীর মতো। সে বসেছে করিম আঙ্কেলের পাশে। যমুনাকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

স্ক্রিপ্ট পড়া শুরু করার ঠিক আগমুহূর্তে করিম আঙ্কেল একটা টেলিফোন পেলেন। হোটেল লবীতে তাঁকে দুই মিনিটের জন্যে যেতে হবে। অতি জরুরি। তাঁর জন্যে ঢাকা থেকে গিফট প্যাকেট নিয়ে একজন এসেছে। প্যাকেটটা দিয়েই চলে যাবে।

হোটেল লবীতে অচেনা এক যুবক দাঁড়ানো। যুবকের মুখ হাসি হাসি। বিনয়ী চেহারা। যুবক বলল, স্যার কেমন আছেন ?

করিম আঙ্কেল বললেন, আমি সবসময়ই ভালো থাকি। আমি কি তোমাকে চিনি ?

যুবক বলল, আমাকে আপনি চেনেন না। তবে আমার স্ত্রীকে চেনেন। আমার স্ত্রীর নাম লাইলি। আমার নাম টুনু।

করিম আঙ্কেল সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, কোয়াইট ইন্টারেস্টিং।

যুবক বলল, পুলিশের ধারণা আমি ক্রসফায়ারে মৃত। ওদের সেই ধারণা দেওয়া হয়েছে। মৃত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা খুবই ইন্টারেস্টিং। তাই না স্যার ?

বুঝতে পারছি না। মৃত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা আমার নেই। দুই মিনিট সময় নিয়ে এসেছিলাম, এখন আমাকে যেতে হবে। সবাই অপেক্ষা করছে।

যুবক বলল, আপনাকে তো যেতে দেওয়া যাবে না। আপনি আমার ভয়ঙ্কর গোপন তথ্য জানেন।

তুমি কী করতে যাচ্ছ ?

আপনার যাতে সহজ মৃত্যু হয় সেই ব্যবস্থা করব। আমি পিস্তল নিয়ে এসেছি। আমার লোকজন আপনাকে ঘিরে আছে। তবে আমি আপনার সঙ্গে একটা নেগোসিয়েশনে যেতে পারি।

কী রকম নেগোসিয়েশন ?

যুবক বলল, নেগোসিয়েশনের ব্যাপারটা এখানে বলা যাবে না। সুইমিংপুলের কাছে চলুন। লোকজন সেখানে কম আছে। দেরি না করে আসুন। আপনার যে কোনো চয়েস নেই এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া আপনার উচিত। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ।

করিম আঙ্কেল ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, সুইমিংপুলটা কোন দিকে ?

আসুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

করিম আঙ্কেল বললেন, আমি একটা বিষয় পরিষ্কার করতে চাচ্ছি। মেয়েমানুষঘটিত কোনো সমস্যা আমার নেই। কোনো মেয়ে যদি আমার কাছে ছুটে আসে তখন 'না' বলি না। কিন্তু আমি কাউকে ডাকি না।

যুবক বলল, লাইলি কেমন আছে স্যার ?

করিম আঙ্কেল বললেন, লাইলি ভালো আছে। আমি তার অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ। 'গুহামানব' নামে আমি যে ছবিটি বানাচ্ছি সেখানে লাইলিকে প্রায় সেন্ট্রাল একটা ক্যারেক্টর দেওয়া হয়েছে। একটা পপুলার হিন্দি গানের চারটা লাইনও সে গাইবে— 'বাচপানকে দিন ভুলানা দেনা'।

যুবক বলল, স্যার চলুন গল্প করতে করতে এগিয়ে যাই। গল্প লম্বা করে আপনার কোনো লাভ হবে না। আপনাকে উদ্ধার করতে কেউ আসবে না। আপনি কি একা একা হাঁটতে পারবেন ? নাকি আমি আপনার হাত ধরব ?

করিম আঙ্কেলের ডেডবডি সুইমিংপুলে ভাসছে—এই খবর দলের বাকিদের কাছে পৌঁছল রাত দশটায়। যে পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছে সেই পিস্তলটা ছিল তাঁর হাতে। পাথরচাপা দেওয়া একটা স্যুইসাইড নোটও পাওয়া গেল। সেখানে লেখা— জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত হতাশায় এই কাজ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। আমার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী।



মর্জিনা তার বাবার কবর চালাঘরের উত্তরদিকে দিয়েছে। পাকুরগাছের নিচে। বড় গাছপালার নিচে কবর হওয়া ভালো। গাছ আল্লাহপাকের নাম নেয়। এতে কবরবাসীর গোরআজাব কমে। এখন তার মনে হচ্ছে, এত কাছে কবর দেওয়া ঠিক হয় নি। সন্ধ্যার পর থেকে মর্জিনার ভয় ভয় লাগে। এক রাতে সে স্পষ্ট দেখেছে, বুড়োমতো এক লোক কবরের ওপর বসে জিকিরের ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছে। বুড়োটা যে তার বাবা এই বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। শুভ্রকে সে ঘটনাটা বলেছে। শুভ্র শব্দ করে হেসেছে।

মর্জিনা বলল, হাসেন কী জন্যে ?

শুভ্র বলল, তোমার কথা শুনে হাসি।

মর্জিনা বলল, হাসির কথা কী বললাম ?

শুভ্র বলল, যে কবরের ওপর বসে ছিল তার গায়ে কাপড় ছিল ?

মর্জিনা বলল, অবশ্যই। লুঙ্গি ছিল। গেঞ্জি ছিল। মাথায় টুপি ছিল।

শুভ্র বলল, ধরে নিলাম তোমার বাবার ভূত কবরে বসা ছিল। সে জামাকাপড় পাবে কোথায় ? জামাকাপড়ের তো ভূত হবার সুযোগ নেই।

মর্জিনা বলল, তাইলে আমি দেখলাম কী ?

শুভ্র বলল, আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদের আলোয় পাকুরগাছের ছায়া পড়েছে কবরের ওপর। বাতাসে গাছ দুলছে। তোমার কাছে মনে হয়েছে ছায়া দুলছে। তোমার মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করে নিয়েছে এই ছায়া তোমার বাবা।

মর্জিনা বলল, আপনের মাথা! যদিও সে বলল 'আপনের মাথা', কিন্তু শুভ্রর যুক্তি ফেলে দিতে পারল না। যতই দিন যাচ্ছে ততই সে মানুষটার কাজকর্ম এবং কথাবার্তায় মুগ্ধ হচ্ছে। প্রতি শনিবার রাতে স্কুলঘরের উঠানে বসে শুভ্র নানান কথা বলে। চরের সবাই মন দিয়ে শোনে। কথাগুলির একটা নামও আছে—ছাইনছের (Science) কথা। মেয়েরা এইসব কথা শুনতে যায় না। তবে মর্জিনা যায়। তার ভালো লাগে এবং অস্থির লাগে। অস্থির লাগার কারণ, এই মানুষ সারা জীবন চরে

পড়ে থাকবে না। একসময় যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরে যাবে। তখন তার কী হবে ? চর থেকে তাকে উচ্ছেদ করলে সে যাবে কোথায় ? নটি মেয়ে হয়ে যাবে ? পাড়ায় বাস করা শুরু করবে ?

মর্জিনা!

বলেন, কী বলবেন।

শুভ্র বলল, একটা কাজ করো, এখন থেকে একটা হারিকেন জ্বালিয়ে কবরের মাঝখানে রেখে দিয়ো। তাহলে আর কোনো ছায়াও দেখবে না, ভয়ও পাবে না।

মর্জিনা বিরক্ত গলায় বলল, আপনের কী যে কথা! কবরে হারিকেন জ্বলে এমন কথা কোনোদিন শুনছেন ? আপনের মাথা খারাপ। আপনের মাথায় উল্টাপাল্টা চিন্তা আসে। আমার তো মাথা খারাপ না। কবরের উপরে হারিকেন। কী যে কথা!

শুভ্রর প্রস্তাব বিরক্ত হয়ে বাতিল করে মর্জিনা হারিকেনে কেরোসিন ভর্তি করে। কাচ পরিষ্কার করে হারিকেন জ্বালায়। তার বাবার কবরে হারিকেন রাখতে রাখতে মনে মনে বলে, বাপজান, ভয় দেখায়ো না গো।

সে বাড়ির উঠানে বসে তাকিয়ে থাকে বাবার কবরের হারিকেনের দিকে। শুভ্র তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। তারাভর্তি আকাশ। চাঁদ উঠলেই তারাদের ঔজ্জ্বল্য কমে যাবে। তখন অন্য শোভা।

মর্জিনা!

বলেন, কী বলবেন। চা দিতে বলবেন না। ঘরে চায়ের পাত্তি নাই।

শুভ্র বলল, একটা দুরবিন থাকলে ভালো হতো। আকাশের তারা দেখতে পারতাম। আধুনিক দুরবিন আবিষ্কার করেন জ্যোতির্বিদ কেপলার। বেচারার চোখ ছিল আমার চেয়েও খারাপ। দুরবিন দিয়ে তিনি কিছুই পান নি।

মর্জিনা হাই তুলতে তুলতে বলল, উনার কপালে নাই। উনি কী করব!

শুভ্র বলল, টমাস আলভা এডিসন আবিষ্কার করেছিলেন গ্রামোফোন। বেচারা তাঁর আবিষ্কার করা গ্রামোফোন থেকে কোনো শব্দ শুনতে পান নি। উনি তখন ছিলেন বধির।

মর্জিনা বলল, প্যাচাল বন্ধ করেন। আপনার প্যাচাল শুনতে ভালো লাগে না।

শুভ্র চুপ করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মর্জিনার মন খারাপ হয়ে গেল। সে ঠিক কথা বলে নি। শুভ্রর প্যাচাল শুনতে তার খুব ভালো লাগে। শুভ্রর আশেপাশে থাকতে ভালো লাগে। তাকে নিয়ে আজেবাজে চিন্তা করতেও ভালো লাগে। রোজ রাতে সে শুভ্রকে নিয়ে আজেবাজে চিন্তা করে। সেইসব চিন্তায় শুভ্রর সঙ্গে তার বিয়ে

হয়েছে। চাঁদনি রাতে দু'জনে হাতধরাধরি করে নদীতে সিনান করতে যাচ্ছে। সিনানের অংশটাও মর্জিনা চিন্তা করে। এই অংশ ভয়ঙ্কর।

মর্জিনা বারান্দা থেকে উঠে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। এই মুহূর্তে সে একটা জটিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুভ্র যেদিন চর ছেড়ে চলে যাবে সেদিনই সে পাকুরগাছে দড়ি ঝুলিয়ে ফাঁস নিবে। বাবার কবরের ওপর সে মরে দোল খেতে থাকবে। সিদ্ধান্তটা নেবার পর তার মনের অস্থিরতা অনেকটা কমল। সে শুভ্রর পাশে এসে দাঁড়াল। হালকা গলায় বলল, ভাইজান চা খাবেন?

শুভ্র বলল, তুমি না বললে চা-পাতা নেই!

হেকমতের দোকান থাইকা আইন্যা দিব। দোকান খোলা আছে। আমি চা নিয়া আসি, আপনে আসমানের তারা দেখতে থাকেন।

শুভ্র বলল, চা আনতে হবে না। বসো এখানে, গল্প করি।

মর্জিনা বলল, আগে চা নিয়া আসি। তারপর যত ইচ্ছা গল্প করবেন।

হেকমত বলল, রাইতে একলা আসছ চা নিতে, সমস্যা কী?

মর্জিনা বলল, ভাইজানের চায়ের পিয়াস লাগছে, এইজন্যে আসছি।

হেকমত বলল, পিয়াস তো আমারও লাগছে। অন্য পিয়াস। এর গতি কী?

মর্জিনা বলল, বিয়া করেন। বিয়া ছাড়া এর গতি নাই।

হেকমত বলল, তুমি রাজি থাকলে তোমারে বিবাহ করতে পারি। রাজি আছ?

মর্জিনা বলল, এক শর্তে রাজি আছি।

শর্তটা কী?

মর্জিনা বলল, আপনে আপনের দোকান থাইকা হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করবেন। দূর থাইকা যেন মনে হয় চরের বেওয়ারিশ কুত্তা হাঁটতেছে। এইভাবে আমার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া বলবেন, মর্জিনা, তোমারে বিবাহ করতে চাই। আমি সাথে সাথে রাজি হব। কাজি ডাইক্যা বিবাহ। ভাইজান হইব সাক্ষী। আমারে আপনের হাতে তুইল্যা দিব।

হেকমত বলল, পাগলের সাথে রাইতদিন থাকস বইল্যা তোরও মাথা খারাপ হইছে। যা ভাগ।

চর এলাকায় ভূমি সেটেলমেন্টের কানুনগো এসেছেন চেইন নিয়ে। চর মাপা হবে। সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ। কানুনগোর নাম গঙ্গা ভট্টাচার্য। তিনি চরে নেমেই ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি ঘুষ খান না। একটা ছেঁড়া দুই টাকার

নোটও না। ঘুষ তার কাছে গোমাংসের মতো। তবে তিনি বাড়িতে একটা স্কুল দেবেন বলে মানত করেছেন। সেই উদ্দেশ্যে যদি কেউ কিছু দিতে চায়, তাহলে আলাদা কথা।

চরের বেশ কিছু লোক তার সঙ্গে ঘুরছে। চেইন টানছে। কাজটায় তারা খুবই উৎসাহ পাচ্ছে। গঙ্গা ভট্টাচার্য এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করলেন, চরের নাম কী ?

কোনো নাম তো নাই।

গঙ্গা ভট্টাচার্য বললেন, একটা নাম তো দেওয়া দরকার। আপাতত দিয়ে রাখি। সরকার যদি বদলাতে চায় পরে বদলাবে।

একজন বলল, নাম দেন শুভ্রর চর।

কী বললেন ?

শুভ্রর চর।

উপস্থিত সবাই বলল, এটা একটা ভালো নাম হয়েছে।

গঙ্গা ভট্টাচার্য সেটেলমেন্টের খাতায় লিখলেন চরের নাম শুভ্রর চর। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, এই নাম অতি দ্রুত স্থায়ী হয়ে গেল। খেয়াঘাটের মাঝি বলা শুরু করল, নাও ছাড়ে, নাও ছাড়ে, শুভ্রর চর শুভ্রর চর।

জমি মাপামাপির তৃতীয় দিন দুপুরে গঙ্গা ভট্টাচার্যের কাছে হারুন এসে উপস্থিত। হারুন টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছে। কানুনগো সাহেবের সঙ্গে একত্রে দুপুরের খানা খাবে। হারুন বলল, আপনি নিষ্ঠাবান মানুষ খবর পেয়েছি। ছেঁড়া দুই টাকার নোটও নেন না।

গঙ্গা ভট্টাচার্য বললেন, সঠিক খবর পেয়েছেন। ঘুষ এবং গোমাংস আমার কাছে তুল্য মূল্য। তবে স্কুল দিচ্ছি। স্কুলের সাহায্যার্থে যে যা দিবে তাই নিব।

তখন কি মাপ উনিশ-বিশ করবেন ?

করব। একটা ভালো কাজ করতে হলে কিছু মন্দ কাজও করতে হয়। স্কুল দেওয়া বিরাট কাজ।

হারুন বলল, আপনার মতো পুণ্যবান মানুষের সঙ্গে খানা খাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আসেন দুইজনে মিলে খানা খাই। আমি খানা নিয়ে এসেছি। খাসির মাংস খান তো ?

গঙ্গা ভট্টাচার্য বললেন, খাসির মাংসে কোনো আপত্তি নাই।

গঙ্গা ভট্টাচার্য তৃপ্তি করে খেলেন। মুসলমান বাড়ির মাংস রাঁধা যে অসাধারণ এই কথা কয়েকবার বললেন।

হারুন বলল, খাসির মাংস হিসাবে যা খেয়েছেন তা গরুর মাংস। আপনার জাত চলে গেছে। সেটা কোনো বিষয় না। জীবন যে এখনো আছে, এইটাই বড়

কথা। তাড়াতাড়ি চর ছাইড়া ভাগেন। বিরাট মারামারি হবে। আপনি নিরীহ মানুষ। চর দখলের মারামারিতে জীবন দিবেন, এইটা কেমন কথা!

আপনি কি সত্যই আমাকে গরুর মাংস খাইয়েছেন ?

আরে না। তামাশা করেছি। আপনারে গরুর মাংস খাওয়ায়ে আমার লাভ কী ?

গঙ্গা ভট্টাচার্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

হারুন বলল, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় বিদায় হয়ে যান। মারামারি রাতেই শুরু হওয়ার কথা। তিন-চাইরটা লাশ পড়বে। সবই মুসলমান। একটা হিন্দু লাশ পড়া দরকার। এই ভেবে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারে। যদিও আপনি এখন আর হিন্দু না। গরুর মাংস খেয়ে জাত গেছে। পাবলিক তো এই খবর জানে না।

আপনি না বললেন গরুর মাংস না! আমার সঙ্গে তামাশা করছেন ?

হারুন বলল, ব্রাদার, আমি তামাশা করার লোক না।

গঙ্গা ভট্টাচার্য গলায় আঙুল দিয়ে বমি করার অনেক চেষ্টা করলেন। বমি হলো না। তিনি সন্ধ্যার আগেই চর ছেড়ে বিদায় হলেন।

চায়ের দোকানের হেকমত সকাল থেকেই অস্থির বোধ করছে। অস্থিরতার কারণে সে কয়েক কাপ চা খেয়ে ফেলেছে। চায়ের সঙ্গে বিড়ি টানছে। অস্থিরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সে মুখভর্তি পান থাকা সত্ত্বেও চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফেলেছে। অস্থির না হয়ে উপায় কী ? তার কাছে খবর আছে আজ বিকালে ঘটনা ঘটবে। এই জাতীয় ঘটনা রাতের আঁধারে ঘটে। আজকেরটা ঘটবে দিনের আলোয়, সবার চোখের সামনে। যাতে সবাই শিক্ষা পায়। শুভ্র নামের মানুষটার নাম আজ খারিজ হয়ে যাবে। চরবাসীদের নামের তালিকায় এই নাম আর থাকবে না।

কার্যসমাধার লোকজন চলে এসেছে। হারুনের লোক। তাদের দু'জন হেকমতের দোকানে রঙ চা খেয়ে গেছে। অন্য আরেক পার্টি নাজেল হয়েছে। আকবরের পার্টি। এরা হারুন গ্রুপের সঙ্গে হাঙ্গামায় যাবে, তবে শুভ্রকে বিদায় করার ব্যাপারে আকবর গ্রুপের কোনো আপত্তি নেই। হাঙ্গামা বিকাল থেকে শুরু হবে। মাঝরাতে মোটামুটি একটা মীমাংসা হবে। শুভ্র ছাড়াও আরও কিছু লোকজনের নাম খারিজ হবে। অর্ধেকের মতো বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে পরদিন ভোর থেকে সব শান্তিমতো চলবে। হেকমত দোয়া ইউনুস পড়ে যাচ্ছে, তার কোনো ভয় নেই। তারপরেও কিছু বলা যায় না। সে মাছির মতো চারদিকে নজর রাখার চেষ্টা করছে। একটা লঞ্চকে কয়েকবার

যাওয়া-আসা করতে দেখা গেছে। এখন লঞ্চটা মাঝনদীতে। চর থেকে অনেক দূরে। লঞ্চে কী ঘটনা কে জানে!

মর্জিনা চা নিতে এল। হেকমত গলা নিচু করে বলল, খবর কিছু জানো?

মর্জিনা বলল, জানি না।

ঘটনা যে ঘটবে সেইটা জানো!

না। চা নিতে আসছি চা দেন। ঘটনা নিতে আসি নাই। ঘটনা নিতে আসলে গ্লাস ভর্তি কইরা গরম ঘটনা নিতাম।

হেকমত বলল, নানান কিসিমের লোকজন চরে ঘুরাফিরা করতেছে।

মর্জিনা বলল, করুক। আপনের সমস্যা কী? আপনের বরং লাভ। আপনের দোকানে আইসা নগদ পয়সায় চা খাবে।

তোমার ভাইজানের খবর কী?

সে লেখাপড়া নিয়া আছে। একটা ইংরেজি বই আছে। পড়ে আর কুট কুট কইরা হাসে। বইটার নাম—মাছির রাজা।

হেকমত বলল, তোমারে একটা ভালো পরামর্শ দিব, শুনবা?

মর্জিনা বলল, না। এই দুনিয়াতে আমি একজনের পরামর্শই শুনব। ভাইজানের পরামর্শ।

হেকমত বলল, বেশিদিন তার পরামর্শ শুনতে পারবা বইলা তো মনে হয় না। ঘটনা ঘটে যাবে। তোমার ভাইজান মইরা চেগায়া পইরা থাকবে।

মর্জিনা স্বাভাবিক গলায় বলল, তখন আপনের সাথে হাঙ্গা বসব। আপনে আমারে পরামর্শ দিবেন। আমারে চা খাওয়াবেন আর পরামর্শ দিবেন। ইচ্ছা করলে ভাইজানের মতো ছাইনছের বক্তৃতাও দিতে পারেন। আমরা আগে বান্দর ছিলাম পরে মানুষ হইছি—এইসব হাবিজাবি।

মর্জিনা চা নিয়ে চলে গেল। হেকমত বিড়বিড় করে বলল, মাগি তোর উপকার করতে চাইছিলাম। তুই বুঝলি না। তোর নিজের দিনও ঘনাইছে।

শুভ্র নদীতে গোসল করতে যাবে তার প্রস্তুতি চলছে। গায়ে সরিষার তেল মাখা হচ্ছে। মর্জিনা চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে উপস্থিত হলো।

গরম গরম চা খান। চা খায়া নদীতে নামেন। সাঁতার তো শিখছেন। শিখছেন না?

শুভ্র আনন্দিত গলায় বলল, শিখেছি। এখন ডুবসাঁতার ট্রাই করছি।

মর্জিনা নিজের জন্যে সামান্য রেখে চায়ের গ্লাস শুভ্রর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, চরে মনে হয় গণ্ডগোল হইব।

শুভ্র বলল, আসার পর থেকেই শুনছি চরে গণ্ডগোল হবে। হচ্ছে না তো। একবার হয়ে ঝামেলা শেষ হওয়া ভালো।

মর্জিনা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, গণ্ডগোল তো হইবই। আইজ না হইলে কাইল। আমারে নিয়ে চিন্তার কিছু নাই। চিন্তা আপনেরে নিয়া। আমি যদি আপনের পায়ে ধইরা একটা অনুরোধ করি রাখবেন ?

শুভ্র বলল, যে অনুরোধ পায়ে ধরে করতে হয় সেটা অবশ্যই অন্যায় অনুরোধ। এই অনুরোধ আমি রাখব না।

তাইলে কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করেন, তারপর গোসলে যান।

শুভ্র বলল, অংকের গল্প শুনবে ?

মর্জিনা হাই তুলতে তুলতে বলল, যা বলবেন তা-ই শুনব। আপনে তো আর পীরিতের গল্প জানেন না। উপায় কী ?

শুভ্র চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আগ্রহের সঙ্গে বলল, ৩৭ সংখ্যাটা সম্পর্কে বলি। বিস্ময়কর একটি সংখ্যা। এটা একটা প্রাইম নাম্বার। প্রাইম নাম্বার কী জানো ?

না।

যে সংখ্যাকে ১ বা সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় না তাকে বলে প্রাইম নাম্বার।

মর্জিনা হাই তুলতে তুলতে বলল, ও আচ্ছা। এখন বুঝলাম।

শুভ্র বলল, ৩৭ বিস্ময়কর সংখ্যা। কারণ ৩৭ দিয়ে ১১১, ২২২, ৩৩৩, ৪৪৪, ৫৫৫, ৬৬৬, ৭৭৭, ৮৮৮, ৯৯৯ এদের ভাগ দেয়া যায়।

মর্জিনা বলল, ভাগ দিলে লাভ কী ?

শুভ্র বলল, তুমি কি সবকিছু লাভ লোকসান দিয়ে বিচার করো ?

মর্জিনা বলল, দুনিয়াই চলে লাভ লোকসানে, আমি চলব না ? যান সিনান কইরা আসেন। আপনের গফ শুনা আর চোরের 'পাদ' শুনা একই রকম।

শুভ্র বলল, তুমি এই নোংরা কথাগুলি বলা কবে বন্ধ করবে ?

মর্জিনা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, যেদিন থাইকা আপনে পীরিতের গফ বলা শুরু করবেন সেইদিন ছাড়ব। এখন যান সাঁতার দিয়া আসেন। আইজ কি 'ছাইনছের' বক্তৃতা আছে ?

শুভ্র বলল, আছে। আজকের বিষয়বস্তু হলো সূর্য। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, এটা কি জানো ?

মর্জিনা বলল, লোকে আপনেরে পাগল ডাকে, এইটা কি জানেন ?

জানি। ডাকুক যার যা ইচ্ছা।

শুভ্র ডুবসাঁতারের চেষ্টা করছে। চরের পাড়ে বসে মুগ্ধচোখে দেখছে মর্জিনা। তার কাছে মনে হচ্ছে, এত সুন্দর দৃশ্য সে তার জীবনে আর দেখে নাই। কোনোদিন যে দেখবে এমন সম্ভাবনাও নাই।

ভোর সাতটা।

মেরাজউদ্দিন দিনের প্রথম চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। তখনই ভালো খবরটা পেলেন। চিকেন ফেদার কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার আহ্সান খবর নিয়ে ভোর ছ'টায় এসে স্যারের ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় ছিলেন।

মেরাজউদ্দিন বললেন, শুভ্রর খবর পেয়েছ?

জি।

অথেনটিক খবর?

জি। আপনি বললেই আমি এক্ষুনি রওনা হয়ে যাব। স্যারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তোমাকে দেখেই তোমার স্যার হুড়মুড় করে ঢাকার পথে রওনা হবে, এরকম ভাবার কি কোনো কারণ আছে?

আহ্সান বলল, স্যার, আপনি কি যাবেন? হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করি। চরে নামিয়ে দেবে।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তুমি সে কোথায় আছে বের করেছ, তোমার দায়িত্ব শেষ। তুমি শুধু বড় একটা মাছ কেনার ব্যবস্থা করো।

বড় মাছ?

হ্যাঁ। আমাদের কালচারে শুভ সংবাদের সঙ্গে বড় মাছ যুক্ত।

আহ্সান বলল, স্যার যদি কিছু মনে না করেন, আপনি কি যুথী মেয়েটাকে পাঠাবার কথা ভাবছেন?

মেরাজউদ্দিন বললেন, হ্যাঁ। মেয়েদের কাছে দুষ্ট শিশু শান্ত করার অনেক কৌশল আছে। যুথী তাকে দুষ্ট শিশু হিসেবেই দেখবে। শান্ত করে নিয়ে আসবে। মেয়েটার এই ক্ষমতা আছে বলে আমার ধারণা। বড় মাছটা যুথীর জন্যে।

অনেকক্ষণ ধরেই থেমে থেমে কলিংবেল বাজছে।

যুথীর শরীর খারাপ। সে বিছানায় শুয়ে আছে। তার হাতে খবরের কাগজ। হকারকে সে এই মাস থেকে কাগজ দিতে নিষেধ করেছে। খরচে পোষাচ্ছে না, তারপরেও সে কাগজ দিয়েই যাচ্ছে।

খবরের কাগজে বাংলাদেশের এক শিল্পপতির কাঠমুণ্ডুতে আত্মহত্যার খবরটা ভেতরের পাতায় এসেছে। যুথী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল—করিম আঙ্কেল আত্মহত্যা টাইপ না। তাঁর কাছে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। কখন মানুষের মনে কী উঠে আসে কে জানে!

কলিংবেল আবারও বাজছে। যুথী কাগজ হাতেই দরজা খুলল। দরজার বাইরে মেরাজউদ্দিন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ড্রাইভারের হাতে বিশাল এক কাতল মাছ।

মেরাজউদ্দিন বললেন, এত বড় কাতল মাছ দেখেছ ?

যুথী বলল, না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, ভাবলাম একটা মাছ নিয়ে যাই। মাছটা তোমার বাবা-মা'কে দেখাও। তারা আনন্দ পাবেন বলে আমার ধারণা। তারপর ড্রাইভারকে দিয়ে কাটিয়ে আনবে। এত বড় মাছ ঘরে কাটা সম্ভব না।

মেরাজউদ্দিন বসার ঘরে এসে বেতের চেয়ারে বসলেন। আগ্রহ নিয়ে ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলেন। পেনসিলে আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটা বাঁধানো ছবি ছাড়া চোখে পড়ার মতো কিছু নেই। ছবিটা সুন্দর। ছবির চোখে স্বপ্ন। হাতে এঁকে চোখে স্বপ্ন আনা সহজ ব্যাপার না। মেরাজউদ্দিন বললেন, কার আঁকা ছবি ?

যুথী বলল, আমার বড়ভাইয়ের। তার আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার শখ ছিল। গোপনে ভর্তি হয়েও ছিল। খবর পেয়ে বাবা তাকে জুতাপেটা করে ছাড়িয়ে এনেছিলেন।

মেরাজউদ্দিন নিজের মনেই বললেন, Full many a flower is born to blush unseen.

যুথী বাবা-মাকে মাছ দেখাতে নিয়ে গেল। আজহার মাছ দেখে বললেন, এই মাছে কেউ হাত দিবি না। খবরদার। কেউ হাত দিলে হাত কেটে ফেলব। মাছ আমি নিজের হাতে জামাইকে দিয়ে আসব।

যুথী বলল, জামাইটা কে ?

আজহার বললেন, আমার সঙ্গে ফাজলামি করিস ? ডাক্তারকে তুই চিনিস না ? তুই কি ভেবেছিস তোদের গোপন বিয়ের কথা জানি না ?

যুথী বলল, জামাই জামাই খেলাটা বন্ধ করো তো বাবা। তোমার এই খেলা অন্য কেউ ধরতে পারুক বা না-পারুক আমি পারি। মাছটা একজন আমার জন্যে আগ্রহ করে এনেছেন। এখানেই রান্না হবে। তুমি চাইলে ডাক্তার সাহেবকে খেতে বলতে পার।

এত বড় মাছ তোকে কে দিল ? নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে। আমি বার্লি জল খাই না যে ব্যাপার বুঝব না।

সালমা বললেন, তোর বাবার কথায় যুক্তি আছে। এই এক মানুষ, যুক্তি ছাড়া কোনো কথা বলে না।

আজহার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসলেন।

যুথী মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার মতো স্বামীপ্রেমে অন্ধ মানুষও আমি আমার জীবনে দেখি নি। এখন আমি কী করব ? মাছ ফেরত দিয়ে দিব ?

সালমা বললেন, তোর বাপ যেটা বলে সেটা করবি। এই সংসারের প্রধান তোর বাপ, তুই না।

আজহার বললেন, একজন শখ করে একটা মাছ এনেছে। ফেরত দিলে মনে কষ্ট পাবে। মানুষকে কষ্ট দেওয়া আর কাবাঘরের পাথর খুলে নেওয়া একই জিনিস।

যুথী বলল, মাছটা তাহলে কাটতে পাঠাই ?

আজহার বললেন, এই মাছ আমি কাটিয়ে আনব। ইনসট্রাকশান দিয়ে কাটাতে হবে। রাতে পোলাও করতে হবে। এত বড় মাছ পোলাও ছাড়া জমবে না। পোলাওয়ের চাল ঘরে আছে না কিনতে হবে ? ঘরে তো কিছুই থাকে না। মাছটা এনেছে কে ?

শুভ্রর বাবা এনেছেন।

বুঝাই যাচ্ছে উনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। যুথী, ভালোমতো আদরযত্ন কর। আমি সামনে যাব না। পাগল মানুষ, কী বলতে কী বলে ফেলব।

যুথী লক্ষ করল, অনেকদিন পর তার বাবা স্বাভাবিক আচরণ করা শুরু করেছেন। একটা বড় মাছ পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে।

মেরাজউদ্দিন চা খেতে খেতে যুথীর সঙ্গে গল্প করছেন। যুথী খুবই অস্বস্তিতে পড়েছে, কারণ তাঁকে যে চায়ের কাপটা দেওয়া হয়েছে সেখানে ঠিক চুমুক দেওয়ার জায়গাটা সামান্য ভাঙা। মেরাজউদ্দিন ভাঙাটা সরিয়ে সাবধানে চুমুক দিচ্ছেন। ঘরে ভালো কাপও ছিল। বেছে বেছে এই কাপটাই সে দিল! যুথী বলল, স্যার, আমি আপনার কাপটা বদলে দেই ?

মেরাজউদ্দিন বললেন, কাপ বদলাতে হবে না। এই কাপে চা খেয়ে আমি খুবই আনন্দ পাচ্ছি। আনন্দ পাওয়ার কারণটা শুনতে চাও ?

চাই।

আমার বাবা ছিলেন স্কুল টিচার। একজন স্কুল টিচারের আর্থিক অবস্থা তো বুঝতেই পার। বাবার জন্যে যে চায়ের কাপটা ছিল, সেটা ঠিক এই জায়গায় ভাঙা ছিল। বাবাকে নতুন কাপ অনেকবার কিনে দেওয়া হয়েছে, তিনি তারপরেও ভাঙা কাপে চা খেয়ে গেছেন। তিনি বলতেন, আমি ভাঙা কপাল নিয়ে জন্মেছি। আমি তো ভাঙা কাপেই চা খাব।

যুথী বলল, তিনি কি আপনার উত্থান দেখে যেতে পেরেছেন ?

মেরাজউদ্দিন বললেন, না। তিনি কিছুই দেখে যেতে পারেন নি। মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে বললেন, উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু পায়। আমি তোর জন্যে কিছু ঋণ রেখে গেলাম। তুই কিছু মনে করিস না। ঋণ শোধের ব্যবস্থা করিস।

মা, আমি এই কাপে আরেক কাপ চা খাব। এবং যাবার সময় এই কাপটা সঙ্গে করে নিয়ে যাব। সস্তা সেন্টিমেন্টালিটি আমার মধ্যে নেই। বাবার কথা হঠাৎ মনে হওয়ায় নিজের ভেতর খানিকটা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব চলে এসেছে।

যুথী আরেক কাপ চা নিয়ে এল। মেরাজউদ্দিন বললেন, আমি তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি। আমার ছেলে কোথায় আছে, কোন চরে বাস করছে তা তুমি খুঁজে বের করবে এবং তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। আমার ধারণা, তোমার চেয়ে ভালো করে কেউ এই কাজটা করতে পারবে না। মা, ঠিক আছে ?

যুথী বলল, আমি আজই রওনা হব।

মেরাজউদ্দিন বললেন, ছেলের চিন্তায় তার মা নানান পাগলামি শুরু করেছেন। মাঝরাতে বিছানায় উঠে বসে 'শুভ্র কই ? শুভ্র ?' বলে চেঁচাতে থাকেন। ঠিক করেছি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেব।

উনি তার ছেলেকে খুব পছন্দ করেন ?

কোন মা তার ছেলেমেয়েকে পছন্দ করে না তুমি বলো দেখি ? কোনো ছেলে যদি খুন করে এসে মায়ের পাশে দাঁড়ায়, মা তার মাথায় হাত রাখবেন।

যুথী বলল, বাবা মাথায় হাত রাখবেন না ?

মেরাজউদ্দিন বললেন, না। সব সন্তান তার মায়ের অংশ। বাবার অংশ না।



রেহানার শরীর ভয়ঙ্কর খারাপ করেছে। রক্তে সুগার ওঠানামা করছে। হার্টবিট মিস করছে। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাইগ্রেনের তীব্র যন্ত্রণা। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কড়া সিডেটিভ দিয়ে ডাক্তাররা তাকে ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন।

সিডেটিভের ঘুম স্বপ্নহীন হয়। কিন্তু ঘুমের মধ্যে তিনি ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন দেখলেন। কয়েকজন মিলে শুভ্রকে বস্তায় ভরে পানিতে ফেলে দিয়েছে। শুভ্র বস্তার ভেতর থেকে ডাকছে, মা! মা!

রেহানা জেগে উঠলেন। বাচ্চামেয়েদের মতো চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমার শুভ্র কোথায় ? আমার শুভ্র!

নার্স-ডাক্তার ছুটে এল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ডাক্তার সাহেব, আমার শুভ্রকে ওরা বস্তায় ভরে পানিতে ফেলে দিয়েছে।

তাঁকে পেথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে আবারও ঘুম পাড়াতে হলো।

শুভ্র চরের পাড় ঘেঁসে হাঁটছে। সে খবর পেয়েছে, একটা মাঝারি সাইজের হিজল গাছে কয়েকটা মাছরাঙা পাখি বাসা বেঁধেছে। ডিম পেড়েছে। শুভ্র যাচ্ছে মাছরাঙা পাখির বাসা দেখতে। পাখির গায়ের রঙের মতো ডিমগুলির গায়েও নাকি রঙ। কয়েকদিন আগে শুভ্র একটা সাপের ডিম পেয়েছে। ডিমের খোসার রঙ হালকা নীল। ভয়ঙ্কর এক সরীসৃপ নীল রঙের ডিম পাড়ছে—ব্যাপারটা অদ্ভুত। শুভ্র সাপের ডিমটা ফেলে নি। খড় দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছে।

শুভ্রর সন্ধানে মুন্সিগঞ্জ থেকে যুথী খেয়া নৌকায় উঠেছে। মাঝি বলল, আপা, কই যাবেন ? শুভ্রর চর ?

যুথী বলল, হ্যাঁ। যার নামে চরের নাম তিনি কি সেখানেই আছেন ?

মাঝি বলল, এত কিছু তো আপা বলতে পারব না। চরে নাইম্যা খোঁজ নেন।

নৌকার এক যাত্রী বলল, শুভ্র ভাইজান চরেই থাকেন। আপনি তার কাছে যেতে চান ?

হুঁ।

আত্মীয় হন ?

না। পরিচিত। উনি মানুষ কেমন ?

পাগলা কিসিমের। ভালো মানুষ পাগলা কিসিমের হয়, এইটা আল্লাপাকের বিধান।

উনি কী পাগলামি করেন ?

প্রত্যেক শনিবারে বক্তৃতা হয়।

যুথী আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিসের বক্তৃতা ?

'ছাইনছের' বক্তৃতা। যেমন ধরেন গিয়া পিথিমি ভনভন কইরা ঘুরতেছে। কিন্তুক উত্তর-দক্ষিণে ঘুর্ণা নাই। সবই 'ছাইনছের' কথা।

এইসব কথা শোনার জন্যে সবাই আসে ?

যার ইচ্ছা হয় যায়। না গেলে তো কেউ থানা-পুলিশ করবে না।

বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া উনি আর কী করেন ?

গলাপানিতে ডুইব্যা বইসা থাকেন।

নৌকার আরেক যাত্রী বলল, উনার মধ্য পীরাতি আছে। অনেকেই দেখেছে উনি যখন রাতে হাইটা যান তখন তার পিছনে পিছনে একজন যায়। 'কে' বইল্যা আওয়াজ দিলে সে মিলায়া যায়।

যুথী বলল, আপনি নিজে দেখেছেন ?

আমি দেখি নাই, তয় অনেকেই দেখেছে।

যুথী শুভ্রর চরে পৌছল ভরদুপুরে। তার ইচ্ছা করছে 'কী সুন্দর ! কী সুন্দর!' বলে চিৎকার করে উঠতে। খেলার মাঠের মতো বিশাল সবুজ এক প্রান্তর। নদীর ধার ঘেঁসে ঘরগুলিকে মনে হচ্ছে খেলনা ঘর। প্রচণ্ড বাতাস। কিছুক্ষণ পর পর তার শাড়ি ফুলে ফুলে উঠছে। নিজেকে মনে হচ্ছে নৌকার পাল।

দু'টা বাচ্চামেয়ে হাঁটুপানিতে নেমে কী যেন করছে। যুথী জিজ্ঞেস করল, এই, তোমাদের চরটার নাম কী ?

একজন বিরক্ত গলায় বলল, শুভের চর।

যূথী বলল, শুভের চর না। এটার নাম শুভ্রর চর। বলো শুভ্রর চর।

মেয়ে দু'টি ফিরেও তাকাল না। তারা খেলায় মেতেছে।

যূথী বলল, সায়েন্সের বক্তৃতা দেয় যে শুভ্র তাকে তোমরা চেনো ?

ছোট মেয়েটা বলল, দিক কইরেন না কইলাম।

যূথী হাঁটতে বের হলো। সে ঠিক করেছে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। প্রথমে একা একা দ্বীপে চক্কর দেবে। ছোট কোনো ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের এই চরটার নাম কী ?

আজ থেকে দেড়শ' দুশ বছর পর দেশটা অনেক বদলে যাবে। শুভ্রর চর নামটা কি বদলাবে ? মনে হয় না। শুভ্র কে ?— এই নিয়ে নানান গল্প তৈরি হবে। 'উনি বিরাট পীর ছিলেন। জিন পুষতেন। উনি যেখানে যেতেন তার সঙ্গে একটা জিন যেত।'

শুভ্র মুগ্ধ হয়ে পাখির বাসা দেখছে। একটা বাসার মা মাছরাঙা তাকিয়ে আছে শুভ্রর দিকে। মানুষ দেখে সে মোটেও ভয় পাচ্ছে না। ডিম ঢেকে সে বসে আছে বলে ডিমের রঙ দেখা যাচ্ছে না।

আপনের নাম শুভ্র ?

শুভ্র চমকে তাকাল। দু'জন চোখে সানগ্লাস পরা মধ্যম বয়সী অচেনা লোক। তাদের গায়ে চকচকে শার্ট। রোদেপোড়া চেহারা। দু'জনের কেউই মনে হয় কয়েকদিন দাড়ি কামায় নি। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু'জনের একজন কথা বলছে, অন্যজন একটু পর পর গলা খাঁকারি দিয়ে থুথু ফেলছে।

প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, জবাব দেন না কী জন্যে ? আপনের নাম শুভ্র ?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ।

ভালো আছেন ?

হ্যাঁ, ভালো আছি।

পক্ষী দেখেন ?

হ্যাঁ।

আমাদের সঙ্গে একটু আসতে হবে।

কেন ?

কাজ আছে।

কী কাজ ?

সেটা যথাসময়ে জানবেন।

আপনাদের সঙ্গে কোথায় যাব ?

লঞ্চে। একটা লঞ্চ পাড়ে ভিড়ছে, দেখেন নাই ? লঞ্চের নাম এম এল সকিনা।

শুভ্র বলল, চলুন যাই, তবে মর্জিনাকে একটা খবর দেওয়া দরকার। সে দুশ্চিন্তা করবে।

তারে নিয়া আপনের ভাবার কিছু নাই। নিজেরে নিয়া ভাবেন।

শুভ্র বলল, নিজেকে নিয়ে তো আমি কখনো ভাবি না।

এখন ভাবেন। ভাবনার সময় হয়েছে।

এম এল সকিনা লঞ্চটি একতলা। চর থেকে বেশ কিছুটা দূরে নোঙ্গর করে আছে। শুভ্রকে নৌকায় করে সেখানে নেওয়া হলো। লঞ্চের পেছনদিকে ছোট্ট একটা রুমে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। রুমের একটাই জানালা, সেই জানালাও পুরোপুরি খোলা না। সামান্য খোলা। ভেতরটা অন্ধকার। সেখানে পাটি পাতা। পাটির ওপর আধশোয়া হয়ে এক লোক। অন্ধকারেও তার চোখে সানগ্লাস। তার নাম মোবারক। মোবারকের সামনে গামলাভর্তি পাকা কাঁঠাল। কাঁঠালের ওপর নীল রঙের বেশ কিছু পুরুষ্টু মাছি। মোবারক হাত দিয়ে মাছি সরিয়ে কাঁঠালের বিচি মুখে দিচ্ছে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থু করে বিচি ফেলছে। বিচিগুলি টিনের বেড়ায় লেগে ঢং করে শব্দ করছে। শব্দটা মনে হয় তার পছন্দ হচ্ছে। প্রতিবারই শব্দ শোনার পর তার মুখ হাসি হাসি হয়ে যাচ্ছে। সে শুভ্রর দিকে না তাকিয়েই বলল, কাঁঠাল খাওয়ার অভ্যাস আছে ?

শুভ্র বলল, কাঁঠাল আমার পছন্দ না।

গরিবের খানা, এইজন্যে পছন্দ না ?

শুভ্র বলল, ধনী-গরিবের ব্যাপার না। যে খাবার ধনী মানুষ খেতে পারে সেই খাবার গরিব মানুষও খেতে পারে।

লোকটা শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, ধনী-গরিবের খানা এক না। খানা ভিন্ন। তবে গু একই। ধনীর গুতে গন্ধ, গরিবের গুতেও গন্ধ। ঠিক বলেছি না ?

শুভ্র কিছু বলল না।

লোকটা চোখ থেকে চশমা খুলতে খুলতে বলল, আপনেরে নিয়া প্যাঁচাল পারার কিছু নাই। আমি প্যাঁচালের লোক না। কাজের লোক। আমার উপর হুকুম

হয়েছে আপনেরে 'অফ' করে দেয়া। এই কাজটা কিছুক্ষণের মধ্যে করব। শেষ মুহূর্তে কিছু মনে চাইলে বলেন। সিগারেট খাবেন ?

সিগারেট আমি খাই না। আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আমাকে অফ করে দিবেন মানে কী ?

অফ করা বুঝেন না ?

না।

ইলেকট্রিক বাত্তি সুইচ টিপলে অফ হয়—এইটা তো জানেন ?

জানি। কিন্তু আমি ইলেকট্রিক বাতি না। আমি মানুষ।

আপনেরে বস্তায় ভরে দূরে নিয়ে পানিতে ফেলা দেওয়া হবে। বস্তার ভিতর ইট থাকবে। আপনে শান্তিমতো নদীর তলে ঘুমায়া থাকবেন। কেউ আপনেরে ডিসটার্ব করবে না। আপনেও কাউরে ডিসটার্ব করতে পারবেন না। সাইন্সের বক্তৃতা শেষ। এখন বুঝছেন, অফ করা মানে পানিতে ডুইব্যা মরা ? মরলেই অফ। পানিতে ডুবলেও অফ, ইটের ভাটার আগুনে পুড়লেও অফ।

আমাকে অফ করবেন কেন ?

কারণ আপনে বিরাট ঝামেলার লোক। এই চরের নামই হয়ে গেছে শুভ্রর চর। আপনেরে অফ কইরা ঝামেলা মিটাইতে হইবে। এই হুকুম।

হুকুম কে দিয়েছে ?

তার নাম দিয়া কী করবেন ? এখন তৈরি হয়া যান।

কিসের জন্যে তৈরি হব ?

মরণের জন্যে।

শুভ্র অবাক হয়ে বলল, যে মানুষটা আপনার কোনো ক্ষতি করে নি তাকে খুন করতে পারবেন ?

টাকার জন্যে মানুষ পারে না এমন কাজ নাই। তবে আপনেরে সত্য কথা বলি। কাজটা আমি করব না। অন্য একজন করবে। মৃত্যুর আগে মনে কিছু চায় ? চাইলে বলেন। তবে এখন যদি বলেন, পোলাও কোর্মা খাব, খাসির রেজালা খাব, তা পারব না। কাঁঠাল খাইতে মন চাইলে খান।

শুভ্র তাকিয়ে আছে। লোকটার কথা এখনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না। কোনো ঠাট্টা-তামাশা নয় তো ?

আল্লাখোদার নাম নিতে চাইলে নাম নেন। তওবা করতে চাইলে তওবা করেন। নিজে নিজে তওবা করবেন। মাওলানা দিতে পারব না। অজুর পানি দিতে বলব ?

ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনার মুখোমুখি হলে প্রকৃতি ব্যবস্থা নেয়। শরীরে হঠাৎ করেই প্রচুর এড্রেলিন জারক রস চলে আসে। তখন ভয়ঙ্কর বিষয়টাকেও তেমন অস্বাভাবিক মনে হয় না। শুভ্রর মনে হয় তা-ই হলো। সে স্বাভাবিক গলায় বলল, একটা চিঠি লিখব। চিঠিটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। পারবেন ?

ব্যবস্থা করা যাবে। চিঠি কারে লিখবেন ? পিতামাতাকে ?

না। তারা আমার এই চিঠি সহ্য করতে পারবেন না। চিঠিটা লিখব যুথীকে। সে শক্ত মেয়ে আছে, সে সহ্য করতে পারবে।

যুথী কে ? আপনার লাভার ?

সে আমার প্রেমিকা না। আমার পছন্দের একজন। তার গলার স্বর অস্বাভাবিক মিষ্টি।

তার সঙ্গে সেক্স করেছেন ?

শুভ্র বলল, আপনারা যে আমাকে মেরে ফেলবেন সেটা আমি বুঝতে পারছি। মৃত্যুর আগে নোংরা কথা শুনতে ভালো লাগছে না। কাঁঠালের বিচি দিয়ে যে ঢং ঢং শব্দ করছেন এটাও শুনতে ভালো লাগছে না। আমাকে কাগজ-কলম দিন। চিঠি লেখা শুরু করি।

লঞ্চে চিঠি লেখার মতো কাগজ পাওয়া গেল না। দু'টা বলপয়েন্ট পাওয়া গেল। মোবারক কাগজের জন্যে লোক পাঠাল। বস্তার ঝামেলাটা দ্রুত সেরে ফেলতে পারলে ভালো হতো। মোবারক কাজটা করতে পারছে না, কারণ যুথী নামের মেয়েটাকে এই লোক কী লেখে তা তার জানতে ইচ্ছা করছে। সে তার একজীবনে অনেক অদ্ভুত মানুষ দেখেছে। এরকম দেখে নি। ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষীণ ইচ্ছা তার হচ্ছে। ইচ্ছাটাকে সে আমল দিচ্ছে না।

যে কাগজ-কলম আনতে গেছে সে ফিরছে না, তবে লঞ্চের সারেং-এর ঘরে রুলটানা একটা খাতার কয়েকটা পাতা পাওয়া গেল। শুভ্র খাতা নিয়ে উবু হয়ে বসেছে। লেখা শুরু করেছে। মোবারক যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে শুভ্রর কাণ্ডকারখানা দেখছে। কী লেখা হচ্ছে তা সে শুভ্রর ঘাড়ের ওপর উঁকি দিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে।

শুভ্র লিখছে—

> যুথী,
>
> রাশিয়ান পাগলা সাধু রাসপুটিন কীভাবে মারা গেছেন জানো ? তিনি মারা যান পেট্রোগ্রাডে, যার বর্তমান নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ। ১৯১৬ সনে। তাঁকে প্রথমে প্রচুর সায়ানাইড

মেশানো মদ এবং কেক খাওয়ানো হয়। তাতে তাঁর কিছুই হয় না। প্রিন্স Felix Yussupov তখন তাঁর বুকে পিস্তল দিয়ে কয়েকটি গুলি করেন। তাতেও রাসপুটিনের কিছু হয় না। বরং রাসপুটিন প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন। মৃত্যুর কোনো লক্ষণ না দেখে তাঁকে ফেলে দেওয়া হয় Nova নদীতে। তাঁর মৃত্যু হয় পানিতে ডুবে। বলতে ভুলে গেছি, তাঁকে চটের থলিতে ভরে পানিতে ফেলা হয়েছিল।

আমার নিজেকে এই মুহূর্তে রাসপুটিনের মতো লাগছে। কারণটা বলছি।

এই পর্যন্ত লিখে শুভ্র মোবারকের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারবেন ?

মোবারক বলল, অবশ্যই। দুধ চা না রঙ চা ?

শুভ্র বলল, দুধ চা। আপনি একটু দূরে বসতে পারবেন ? ঘাড়ের ওপর দিয়ে কেউ তাকিয়ে থাকলে আমি লিখতে পারি না। ভালো কথা, যে বস্তায় ভরে আমাকে পানিতে ফেলা হবে সেটা কি আনা হয়েছে ?

সব রেডি। বস্তা, ইট, সব।

যে আমাকে পানিতে ফেলবে তাকে আমার দেখার ইচ্ছা ছিল। তার নাম কী ?

তার নাম বলা যাবে না। তবে আপনেরে বলতে বাধা নাই। আপনে তো আর কাউরে গিয়া বলবেন না। সেই সুযোগ নাই। তারে আমরা হায়ার করে এনেছি। তার নাম কানা ছালামত।

একটা চোখ কি নষ্ট ?

চোখ ঠিকই আছে, তারপরেও নাম কানা।

শুভ্র বলল, কানা নাম হবার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গল্প আছে। কলেজে সবাই আমাকে 'কানা বাবা' ডাকত। কারণ আমি চোখে কম দেখি। কানা ছালামতের নামের পেছনের গল্পটা কী ?

এত কথা বলতে পারব না। চিঠি শেষ করেন। হাতে সময় নাই।

শুভ্র বলল, চা আসুক। চায়ে চুমুক দিয়ে লেখা শুরু করি।

যুথী হেকমতের চায়ের দোকানে বসে আছে। হেকমত তাকে বলল, যার জন্যে এসেছেন তার আশা ছেড়ে দেন। সে ধরা খেয়েছে কানা ছালামতের হাতে।

এতক্ষণে বস্তায় ভইরা তারে পানিতে নামায়ে দিয়েছে। খেল খতম কইরা সে পয়সা হজম কইরা ফেলছে।

যুথী বলল, ভ্যাজর ভ্যাজর করবেন না প্লিজ।

আপনার পরিচয় কী ? আপনি তার কে হন ?

আমি তার কেউ হই না। তাকে ঢাকায় ফিরিয়ে নিতে এসেছি। মর্জিনা মেয়েটার ঘর কোথায় ?

জানি না কোথায়। চর তো ছোট না। বিশাল চর। কোন চিপায় ঘর তুলছে খুঁইজ্যা বাইর করেন।

শুভ্র মহাবিপদে পড়েছে, এই ব্যাপারটা যুথীর কাছে এখন পরিষ্কার। বিপদের ধরনটা বুঝতে পারছে না। সে কার কাছে সাহায্যের জন্যে যাবে তাও জানে না। চরে নিশ্চয়ই থানা-পুলিশ নেই। কানা ছালামত নামের একজন কেউ তাকে ধরে নিয়ে গেছে। কানা ছালামতটা কে ? কোথায় তাকে নিয়ে গেছে ? সত্যি মেরে ফেলবে ? মানুষ মারা এত সহজ ?

যুথী হেকমতের দোকান থেকে বের হয়ে মর্জিনার বাড়ি খুঁজে বের করল। চরের সবাই জড়ো হয়েছে সেখানে। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত যুথীর নিজেকে অসহায় লাগছিল, এখন ততটা লাগছে না। চরের মানুষজন শুভ্রর নিখোঁজ হবার খবর পেয়ে পাগলের মতো হয়ে গেছে। তাদের ব্যাকুলতা অবাক হয়ে দেখার মতো।

একজন রোগামতো মানুষ যুথীকে বলল, আফা শুনেন, শুভ্র ভাইজানের ক্ষতি যদি কেউ করে তারে আমরা চাবায়া খায়া ফেলব। সে যত বড় নবাবের পুতই হউক।

সবাই সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, অবশ্যই!

একজন বলল, কানা ছালামতরে আমরা যদি চাবায়া না খাই তাইলে আমরা পিতামাতার জারজ সন্তান।

আবার হুঙ্কার উঠল, অবশ্যই!

মর্জিনা কোনো আলোচনায় অংশ নিচ্ছে না। সে বাবার কবরের পাশে পাকুরগাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার দৃষ্টি অপ্রকৃতস্থের দৃষ্টি। তার হাত মুঠি করা। সেখানে নীল রঙের একটা ডিম। ডিমটা পাখির। শুভ্র ভাইজানের সঙ্গে মজা করার জন্যে সে বলেছিল সাপের ডিম। ভাইজান তা-ই বিশ্বাস করে ডিমটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে। মিথ্যা কথাটা বলার জন্যে মর্জিনার এখন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কান্না আসছে না। ভেতরে ভেতরে মর্জিনা অনেক শান্ত।

তার সবকিছু ঠিক করা আছে। নাইলনের দড়ি পর্যন্ত কেনা আছে। শুভ্র ভাইজানের খারাপ খবর পাওয়া মাত্র সে ঝুলে পড়বে।

যুথীর সঙ্গে একটা মোবাইল টেলিফোন সেট আছে। মেরাজউদ্দিন দিয়ে দিয়েছেন। চরে মোবাইল সেটটা কাজ করছে না। কোনো সিগন্যাল নেই। যুথী ঢাকার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে পারছে না। তবে সে জানে না যে মেরাজউদ্দিন হেলিকপ্টার নিয়ে রওনা হয়েছেন। পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মাথায় হেলিকপ্টার চরে নামবে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসছেন। রেহানা স্বামীর পাশে মূর্তির মতো বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টিও অপ্রকৃতস্থ। কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি তোমার ছেলেকে দেখবে।

রেহানা বললেন, আচ্ছা।

তাকে প্রথম কথা কী বলবে ঠিক করেছ ?

না।

আমি শিখিয়ে দিব ?

দাও।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তুমি তাকে বলবে ইউ নটি বয়।

রেহানা বিড়বিড় করে বললেন, ইউ নটি বয়। ইউ নটি বয়। ইউ নটি বয়।

শুভ্রকে লঞ্চের ছাদে আনা হয়েছে। সেখানে কানা ছালামত তার দুই সঙ্গী নিয়ে বসা। তাদের সামনে ইটভর্তি চটের বস্তা। কানা ছালামত বলল, আপনি যে চিঠি লিখেছেন সেটা পড়লাম। চিঠি সুন্দর লিখেছেন। এই অবস্থায় ঠান্ডা মাথায় একটা চিঠি লিখতে পেরেছেন, এটা অনেক বড় ব্যাপার।

শুভ্র বলল, অন্যকে লেখা চিঠি পড়েছেন, কাজটা তো ঠিক করেন নি।

কানা ছালামত বলল, আমার সব কাজই তো বেঠিক।

শুভ্র বলল, ঠিকানা লিখে দিয়েছি। চিঠিটা ঠিকমতো পৌঁছাবেন।

কানা ছালামত হাসল। শুভ্র বলল, আপনার চোখ তো ঠিক আছে, আপনার নাম কানা ছালামত কেন ?

কানা ছালামত বলল, নিজেই নিজের নাম দিয়েছি। একেক সময় একেক নাম দেই। আমার আগের নাম ফ্রুট ফোটন। র‍্যাবের ক্রসফায়ারে তার মৃত্যু হবার পর নতুন নাম কানা ছালামত।

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

কানা ছালামত বলল, বুঝতে না পারলে নাই। শুনেন, যাকে চিঠি লিখেছেন সে চরে উপস্থিত আছে। আপনি এক কাজ করেন, নিজের হাতেই তাকে চিঠিটা দেন। সে খুশি হবে।

যুথী চরে এসেছে ?

হ্যাঁ।

আপনি তাকে চেনেন ?

একসময় চিনতাম।

শুভ্র চমকে উঠে বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি যুথীর বড়ভাই টুনু ? এতক্ষণ খেয়াল করি নি, আপনার সঙ্গে যুথীর চেহারার অস্বাভাবিক মিল। আপনার গলার স্বরও যুথীর মতোই মিষ্টি।

কানা ছালামত বলল, আমি কারোর ভাই না। কারোর স্বামীও না। আমি কানা ছালামত। কোষা নৌকা বাইতে পারেন ? নৌকা বাওয়া শিখেছেন ?

অল্পস্বল্প পারি।

লঞ্চের সঙ্গে কোষা নৌকা বাঁধা আছে। নৌকা নিয়ে চলে যান। আমরাও লঞ্চ নিয়ে বিদায় হব। আরেকটা শেষ কথা শুনে যান। যুথীর কাছে লেখা চিঠিটা পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। করিম আঙ্কেল নামের একটা লোককে গুলি করে মেরে যেরকম আনন্দ পেয়েছিলাম, সেরকম আনন্দ। দু'টা সম্পূর্ণ দু'রকম জিনিস, কিন্তু আনন্দ একই। এটাই আশ্চর্যের বিষয়। যাই হোক, বিদায়।

শুভ্র বলল, আপনার স্ত্রীর নাম কি লাইলি ?

একটু আগে কী বলেছি ? আমার কোনো বোন নাই। আমার কোনো স্ত্রীও নাই।

শুভ্র বলল, আপনি যদি না জানতেন যুথীকে আমি চিনি, তাহলে কি আপনি বস্তায় ভরে পানিতে ফেলতে পারতেন ?

পারতাম।

শুভ্র বলল, আমার খুব শখ ছিল অতি ভয়ঙ্কর কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব।

আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, শখ মিটার কথা। মিটে নাই ?

শুভ্র বলল, আমি বইতে পড়েছি সিরিয়াল কিলারদের মানসিক গঠন অন্যরকম। তারা ভালো এবং মন্দ আলাদা করতে পারে না। তাদের মধ্যে পাপবোধের ব্যাপার নেই। আপনারও কি তাই ?

টুনু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে তার সঙ্গীকে বলল, শুভ্রকে নৌকায় তুলে দিয়ে লঞ্চ ছাড়ার ব্যবস্থা কর।

শুভ্র বলল, আর পাঁচটা মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলি প্লিজ। আপনি কি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের *ফর হুম দ্যা বেল টোলস* বইটা পড়েছেন ? বইটার শুরুতে গীর্জায় মৃত্যুঘন্টা নিয়ে একটা কথা আছে।

টুনু সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। তারা শুভ্রকে ধরে নিয়ে গেল।

হেলিকপ্টার নিয়ে মেরাজউদ্দিন নেমেছেন। তাঁর স্ত্রীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছেন। যূথী ছুটে এসে তাদের পাশে দাঁড়াল। মেরাজউদ্দিন আনন্দিত গলায় বললেন, চরের লোকজন মাথা কামানো যে যুবকটিকে কাঁধে নিয়ে হৈচৈটি করছে সে কি আমাদের শুভ্র ?

যূথী বলল, জি স্যার।

রেহানা বিড়বিড় করে বললেন, শুভ্র ইউ নটি বয়।

মেরাজউদ্দিন বললেন, রোদে পুড়ে গায়ের রঙ তামার মতো হয়ে গেছে। এখন তার নতুন নাম হওয়া উচিত তাম্র। রেহানা তুমি বলো, তাম্র ইউ নটি বয়।

রেহানা বললেন, তাম্র ইউ নটি বয়।

মেরাজউদ্দিন বললেন, অলিম্পিকের হাইজাম্পের মতো যে মেয়েটা হাইজাম্প দিচ্ছে সে মনে হয় মর্জিনা।

যূথী বলল, মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক। জি স্যার।

মেরাজউদ্দিন বললেন, মনে হচ্ছে শুভ্র এই দ্বীপের যুবরাজ।

যূথী বলল, স্যার, এই চরের নাম শুভ্রর চর। আপনার ছেলে কত ভাগ্যবান! তার নামে একটা জায়গার নাম হয়ে গেছে।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তুমি কাঁদছ কেন ?

চরের বালি বাতাসে উড়ে চোখে পড়ছে, এইজন্যেই বারবার চোখে পানি আসছে।

চরের কিছু বালি মনে হয় মেরাজউদ্দিনের চোখেও পড়েছে, তাঁর চোখ ভিজে উঠেছে। তিনি দ্রুত হিসাব করছেন শেষ কবে কেঁদেছেন। মনে করতে পারছেন না। তিনি নিজের ওপর সামান্য বিরক্ত হচ্ছেন।

হিজলগাছে বাসা বাঁধা মাছরাঙা পাখিটাও খুব বিরক্ত হচ্ছে। হেলিকপ্টারের শব্দ, লোকজনের চিৎকারে সে ঠিকমতো ডিমে তা দিতে পারছে না। তার

সন্তানদের ডিম থেকে বের হয়ে আসার সময় হয়ে গেছে। অদ্ভুত সুন্দর এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে মা মাছরাঙা ছটফট করছে। একসময় মা পাখি ডিমের ওপর থেকে উঠে দ্বীপের ওপর দিয়ে একটা চক্কর দিল। দ্বীপে কী ঘটছে সে দেখতে চায়। তার অনাগত সন্তানদের ক্ষতি হবে এমন কিছু ঘটছে না তো ?

রেহানা মা পাখিটার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বললেন, দেখো দেখো! কী সুন্দর একটা মাছরাঙা।



আমি হুমায়ূন আহমেদ, ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সনে নানাবাড়ি মোহনগঞ্জে (নেত্রকোনা জেলা) জন্মগ্রহণ করেছি। পাসপোর্ট এবং সার্টিফিকেটে লেখা ১০ এপ্রিল ১৯৫০, কেন এই ভুল হয়েছে জানি না।

মা আয়েশা আক্তার। বাবা-মা দু'জনই লেখালেখি করতেন। কিছুদিন আগে মা'র আত্মজৈবনিক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মোটামুটি হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন।

আমার সংসার শাওন এবং পুত্র নিষাদকে নিয়ে। গায়িকা শাওন প্রতি রাতে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে পুত্রকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে। পুত্র ঘুমায় না, আমিই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যেই মনে হয়, জীবনটা খারাপ না তো !

Shuvro Geche Bone by Humayun Ahmed